ইসলাহী বয়ান

কুরআন-হাদীসের শুধু অনুবাদ পড়ে আমল করা গোমরাহী

আমল করতে হবে সুন্নাহর উপর

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

এ বয়ানের বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে। বর্তমানে অনেকে সুন্নাহর ওপর চলার দাবি করেন; কিন্তু সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে নিজেরাও গোমরাহ হচ্ছেন, অন্যকেও গোমরাহ করছেন। এ প্রসঙ্গে বক্ষ্যমান আলোচনাটি অত্যন্ত সারগর্ভ ও ফলপ্রসু বিবেচনায় দ্বি-মাসিক রাবেতার পাঠকদের জন্য পত্রস্থ করা হলো।

হামদ ও সালাতের পর...

দীন-ইসলামের বিধান একদিনে পূর্ণতা লাভ করেনি; বরং তা দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা এবং সার্বজনীনতা লাভ করেছে। একেকটি বিধান পর্যায়ক্রমে একাধিকবার নাযিল হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। উম্মতের জন্য আমলযোগ্য হলো কুরআন-সুন্নাহর সর্বশেষ হুকুম। আর আমলযোগ্য এ সর্বশেষ হুকুমকেই 'সুন্নাহ' বলা হয়ে থাকে। শুরু যামানার বিধানগুলো– যা পরবর্তী সময়ে রহিত হয়ে গেছে– সে সব বিধানগুলো 'হাদীস' হলেও তা সুন্নাহ তথা আমলযোগ্য নয়।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেইশ বছরের যিন্দেগীর সকল ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। সুন্নাহ তথা সর্বশেষ নাযিলকৃত বিধি-বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রহিত হয়ে যাওয়া প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন 'হাদীস'। বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কেউ যদি শুধু অনুবাদ নির্ভর হয়ে আমল করতে চায় তবে সে নিঃসন্দেহে গোমরাহীর সম্মুখীন হবে। আমাদের অনেক ভাই জুমু'আর দিন মসজিদে এসে খুতবা চলা অবস্থায় নামায পড়া আরম্ভ করে। মনে হয় যেন খতীব সাহেবের সাথে মোকাবেলা করতে এসেছে। মূলত তারা কুরআন হাদীসের অনুবাদ পড়ে আমল করে। উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করে না। কুরআন হাদীসে থাকলেই আমল করতে হবে– এই চিন্তাটাই গলদ। বরং আমল করতে হবে কুরআন-হাদীসের সর্বশেষ বিধান তথা সুন্নাহর উপর। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনের একাধিক আয়াত এবং হাদীসের কিতাব হতে বেশ কয়েকটি বিধান উল্লেখ করবো, যে হুকুম-আহকাম প্রাথমিক যামানায় পালনীয় থাকলেও পরবর্তীতে রহিত হয়ে যাওয়ায় এখন উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়। এ কারণেই কেবল কুরআনের অনুবাদ পড়ে যেমন আমল করা বৈধ নয়, তেমনি শুধু হাদীসের তরজমা পাঠ করে আমল করাও জায়েয নয়।

শুধু কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পড়ে আমল করা বৈধ নয়

কুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয় এবং তারাবীহতে তিলাওয়াত না করলে খতম পূর্ণ হয় না। এতদসত্ত্বেও সে আয়াতে উল্লিখিত বিধানাবলী রহিত হয়ে যাওয়ায় তার উপর আমল করা উম্মতের জন্য জায়েয নয়।

দৃষ্টান্ত এক :

সূরা বাকারার ১৮০নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হয় আর তার ধন-সম্পদও থেকে থাকে, তাহলে সে তার মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করে যাবে। মুত্তাকীদের জন্য এটি অবশ্য করণীয়।

অথচ এ আয়াতের উপর আমল করা হারাম; কেননা এ বিধানটি সূরা নিসার ১১নং আয়াত দ্বারা মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওসিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

এই আয়াত এবং তার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল ওয়ারিসের প্রাপ্য অংশ খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আয়াতদ্বয় নাযিল হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এখন থেকে নির্ধারিত অংশের হকদারদের জন্য ওসিয়্যত বৈধ নয়। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৬৬৬)

দৃষ্টান্ত দুই :

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৪০নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়ত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোশ গ্রহণের) সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা যাবে না। হ্যাঁ, তারা নিজেরাই যদি বের

হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।'

উক্ত আয়াতে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে এক বছর ইদ্দত পালন করতে বলা হয়েছে। অথচ এই হুকুমকে রহিত করে পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায় তাদের স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে'। (সূরা বাকারা- ২৩৪)

হাদীস শরীফের ন্যায় কুরআন পাকের আয়াতসমূহও অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজানো হয়নি। অতএব শুধু কুরআনের অনুবাদ পড়ে আমল করা নিশ্চিত গোমরাহী।

দৃষ্টান্ত তিন :

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রোযার বিধান এসেছে শিথিলভাবে। যাদের সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহরী খেয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা এবং গুনাহ বর্জনের হিম্মত হয় তারা রোযা রাখবে। হিম্মত না হলে না রাখারও সুযোগ ছিলো। প্রতি রোযার বদলে একজন ফকীরকে দুবেলা খাওয়ালে বা এর মূল্য দিয়ে দিলে রোযা আদায় হয়ে যেতো।

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ : যারা রোযা রাখার সামর্থ রাখে, তারা একজন মিসকিনকে খানা খাইয়ে (রোযার) ফিদয়া আদায় করতে পারবে। (সূরা বাকারা- ১৮৪)

রোযার এ প্রাথমিক বিধানের সময় অনেকেই রমাযানে হিম্মত করে রোযা রাখতেন আর কোন কোন সাহাবী ফকীরকে দু'বেলা খাওয়াতেন। তবে তারাও নিজেদের পিতা মাতা, ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের রোযা রাখা দেখে বুঝতে পারলেন যে, সারাদিন খানা পিনা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে রোযা রাখা সম্ভব, এবং আগামীতে রোযা রাখার নিয়ত করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ : এখন থেকে তোমাদের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি রমাযান মাস পেলে অবশ্যই রোযা রাখবে। (সূরা বাকারা- ১৪৫)

সক্ষমদের রোযা না রেখে ফকীরকে খানা খাওয়ানোর বিধান রহিত হয়ে গেলো। এ হুকুম শুধুমাত্র অতিশয় বৃদ্ধ, মুমূর্ষু রোগীদের জন্য বহাল থাকলো। তারা প্রতিটি রোযার বদলে একজন ফকীরকে দু'বেলা খানা খাওয়াবে বা একটি সদকায়ে ফিত্‌র পরিমাণ মূল্য দিয়ে দিবে। (হাশিয়াতুত তাহতাবী ১/৪৮০)

দৃষ্টান্ত চার : মদ নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা মদকে কয়েক ধাপে নিষেধ করেছেন। প্রথমে মদের ক্ষতির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে আসতে নিষেধ করেছেন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায পড়লে কেরাআতে ভুল হতে পারে। এভাবে কয়েক ধাপের পর এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারির তীর, এসব গর্হিত বিষয় শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই না; সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মাইদাহ- ৯০)

প্রথমদিনই মদ নিষিদ্ধ করলে আমল করা কষ্টকর হত। এই জন্য দিল তৈরি করার পর আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করলেন। তখন আমল করতে বিন্দুমাত্রও দেরি হয়নি।

এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে মদীনার অলিতে গলিতে আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আয়াত শোনার সাথে সাথে যারা মদ পান করছিলো গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেললো। যাদের ঘরে মদ ছিলো তারা পাত্র ভেঙ্গে ফেললো। ব্যবসায়ীরা মদের মশকগুলো (চামড়ার পাত্র যেগুলোতে মদ ছিলো) চাকু দিয়ে ফেড়ে দিলো। ফলে রাস্তা ঘাট মদের বন্যায় ভেসে গেলো। দিল তৈরি হওয়ার কারণে এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রথমে উম্মতের দিল তৈরি করেছেন। তখন উম্মতের নামায-রোযা সহ অন্যান্য সকল আমল ঠিক হয়ে গেছে। (সুনানে বাইহাকী; হা.নং ১১৫৫২)

হাদীসের কিতাবাদিতে সাহাবায়ে কেরামের মদ পান করার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে বর্ণনাগুলো কেবল হাদীস, সুন্নাত তথা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়; বরং আমলযোগ্য হলো এ ব্যাপারে সর্বশেষ হুকুম তথা মদ হারাম।

সারকথা, কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলী তেইশ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে এভাবেই ধাপে ধাপে পূর্ণতা লাভ করেছে। সর্বশেষ বিদায় হজ্জে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে এবং তোমাদের ওপর আমার নে'আমতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর আমি একমাত্র ইসলামের ওপর রাযি হয়ে গেলাম। (সূরা মায়িদাহ- ৩)

এখন উম্মতের জন্য আমলযোগ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর সর্বশেষ হুকুম তথা সুন্নাত। আর কুরআন-হাদীসের যে সকল বিষয় কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো, অর্থাৎ যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, সে সকল বিধানাবলী সুন্নাত তথা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়। রহিত হয়ে যাওয়া সে বিধানাবলী কুরআন হাদীস থেকে পাঠ করলে সওয়াব হবে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করলে সওয়াবের পরিবর্তে মারাত্মক গুনাহ হবে।

হাদীসের বর্ণনাসমূহের তরজমা পড়ে আমল করাও বৈধ নয়

দৃষ্টান্ত : নামায প্রসঙ্গ

মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে কয়েকটি জিনিস হাদিয়া দিলেন। **প্রথম হাদিয়া :** শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে কবরে আসার ওপর জান্নাতের ওয়াদা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১২৩৭)

আল্লাহ তা'আলার নিকট শিরকযুক্ত ঈমানের কোন মূল্য নেই। শিরকের উদাহরণ হলো, মাযারে প্রার্থনা করা, সিজদা করা, মাযার তাওয়াফ করা ইত্যাদি। মাযার কেন্দ্রিক যা কিছু হয় প্রত্যেকটা ঈমান বিধ্বংসী।[১]

বর্তমানে এনজিও, খ্রিস্টান মিশনারীগুলো অনেক ভালো ভালো কাজ করছে, বাড়ি বাড়ি টয়লেট বানিয়ে দিচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল বানিয়ে দিচ্ছে,

১. উল্লেখ্য, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকারসহ বিভিন্ন আমল করে সওয়াব পৌছানোর নিয়তে মাজারে যাওয়া শরীয়ত অনুমোদিত। কিন্তু মাজার থেকে কিছু আনার নিয়তে গেলে ঈমান নিয়ে ফিরে আসা যাবে না; দাফন করে আসতে হবে। মাজারওয়ালা তো দূরের কথা, নবী রাসূল পর্যন্ত কোন কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না।

টিউবওয়েল বসিয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি। এসবের কোন বিনিময় তারা আল্লাহর কাছে পাবে না। কেননা, তাদের ঈমান নেই। ইয়াহুদী ধর্ম খ্রিস্টধর্ম এক সময় ঠিক ছিলো। কিন্তু কালপরিক্রমায় তা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেছে। উপরন্তু কুরআন নাযিল হওয়ার পর সব রহিত হয়ে গেছে। মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম– কুরআন ও প্রিয় নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।[২]

মি'রাজের দ্বিতীয় হাদিয়া : নামায। নামায প্রথমে দুই ওয়াক্ত ছিলো। মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত করে দিলেন। ফেরার পথে হযরত মূসা আ. এর অনুরোধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরিয়াদ করায় আল্লাহ তা'আলা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন, আপনার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যদিও আমি পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছি কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে আপনার উম্মতকে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সওয়াব দান করবো। আমার পবিত্র কালাম কখনো পরিবর্তন হয় না। مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ। (সূরা কাফ-২৯)

মি'রাজের দ্বিতীয় হাদিয়া নামাযের এ বিধান ধাপে ধাপে পূর্ণ হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান- প্রাথমিক সময়ে জায়েয ছিলো- পরবর্তীতে তা নাজায়েয করে দেয়া হয়েছে। যেমন-

- এক সময় নামাযে কথা বলা জায়েয ছিলো। একবারের ঘটনা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দুই রাক'আত পড়িয়ে সালাম ফেরালেন। এবং সামনে বেড়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসলেন। জামা'আতে হযরত আবু বকর রাযি. উমর রাযি. এর মত বড় বড় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ভয়ে কারো কিছু বলার সাহস হলো না। যে যত বেশি বড়দের নিকটবর্তী হয় সে তত বেশি ভয় পায় যাতে কোন ধরণের বেয়াদবী না হয়ে যায়। মজলিসে একজন সাহাবী ছিলেন। দাঁড়ালে হাত হাটু পর্যন্ত পৌছুত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যূলইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি সাহস করে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি আল্লাহর পক্ষ থেকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে না কি আপনি ভুলে গেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, كل ذلك لم يكن দু'টির কোনটিই হয়নি। আল্লাহ তা'আলাও কমাননি, আমার জানা মতে আমিও ভুল করিনি। যূলইদাইন রাযি. বললেন, কিছু না কিছু অবশ্যই হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঘটনা যাচাইয়ের জন্য হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলে তারা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায দুই রাক'আত পড়ানো হয়েছে। এসব কথা বার্তার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুই রাক'আত পড়িয়ে সাহু সিজদা করলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৪)

এই হাদীস দেখে যদি বর্তমানে কোন ইমাম সাহেব দুই রাক'আত পড়িয়ে কথাবার্তার পর বাকী দুই রাক'আত পড়ে সাহু সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অথচ ইমাম সাহেব বাহ্যিকভাবে বুখারী শরীফের ওপর আমল করেছেন। বোঝা গেল কুরআন শরীফে থাকলেই কিংবা বুখারী শরীফে থাকলেই আমল করা যাবে না। দেখতে হবে এব্যাপারে একটিই হাদীস বর্ণিত হয়েছে নাকি একাধিক হাদীস। একাধিক হাদীস থাকলে প্রথম হাদীসটি রহিত। শুধু শেষ হাদীসটি আমলযোগ্য। হাদীসের বিশাল ভান্ডারে রহিত হাদীসগুলোও লিপিবদ্ধ আছে। বিষয়টি না জানার কারণে অনেকে বুখারী শরীফে পেলেই আমল শুরু করে দেয়।

- মদীনায় হিজরতের পূর্ববর্তী সময়ে নামাযে রফয়ে' ইয়াদাইন করার (বার বার হাত তোলার) অনুমতি ছিলো। কারণ ৩৬০ খোদার কথা মনে হত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএসব চিন্তা দূর করার জন্য বার বার হাত তোলার পদ্ধতি শেখালেন। ঈমান মজবুত হয়ে যাওয়ার পর নিষেধ করে দিলেন। রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.। মক্কায় রফয়ে ইদাইন করার এবং মদীনায় না করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর একাধিক শাগরেদ বর্ণনা করেন, আমাদের উস্তাদ অব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নামাযের শুরুতে একবার ব্যতীত আর কোন স্থানে হাত ওঠাতেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে যবানী এবং আমলী উভয় বর্ণনা দ্বারা রফয়ে ইয়াদাইন না করা প্রমাণিত। রফয়ে

২. আমাদের সমাজে অনেক ভাই এমন আছে যারা কোন দিন মাদরাসায় পড়েনি, উলামায়ে কেরামের মজলিসে যায়নি, দা'ওয়াত ও তাবলীগেও সময় লাগায়নি; চোখ, কান ফোটার সাথে সাথে বাপ মা ইংলিশ মিডিয়াম, সেন্ট যোসেফ বা সেন্ট পল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলো; কখনো দ্বীন শেখার সুযোগ করে দেয়নি, সেও নিজ আগ্রহে শেখেনি– এ ধরনের লোকেরা সব ধর্মকে সঠিক মনে করে। মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ যে ধর্মালম্বীই হোক না কেন ভালো কাজ করলে বেহেশতে যাবে, খারাপ কাজ করলে দোযখে যাবে– এই হলো তাদের বিশ্বাস। তারা বলে মানবসেবা সবচে' বড় ধর্ম। মানবসেবা নামে কোন ধর্ম আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি।
অবশ্য বর্তমানে কাফেরদের জাগতিক যে উন্নতি-অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তা মূলত মুসলমানদের থেকেই ধার করা। ইসলামের নীতি অনুসরণের কারণেই আজ কাফেররা ব্যবসার ময়দানে বৈশ্বিকভাবে অনেক উপরে। ব্যক্তিজীবনে তারা মদখোর, ব্যভিচারী হলেও ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছে দুনিয়াকে জয় করার জন্য।
যেমন- (১) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আদর্শ হল, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের খোঁজ খবর রাখা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাযি. হযরত উমর রাযি. রাতের আঁধারে জনসাধারণের খবর নিতে যেতেন। অমুসলিমরা এ নীতি গ্রহণ করে আজ বিশ্বের গরীব মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে।
(২) কাফেররা আজ অনেকগুলো রাষ্ট্র মিলে একটি শক্তি বানিয়েছে। এই পদ্ধতিও তারা মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর আট-দশটি এলাকা সংযুক্ত করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রদেশ বানিয়ে দিতেন আর একজন মুফতীকে গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। মানুষেরা গভর্ণরের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করে করে আমল করত। মাযহাবের সূচনা তখন থেকেই। প্রত্যেক প্রদেশে গভর্ণর ভিন্ন হওয়ায় ফতওয়াও ভিন্ন ভিন্ন হত। প্রত্যেকে নিজ নিজ ইলম অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। সব ফাতওয়াই ঠিক ছিল। সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কারো ফাতওয়া ভুল সাব্যস্ত করতেন না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৩৫২)

ইয়াদাইন এক সময় জায়েয থাকলেও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৬৪৯, সুনানে বাইহাকী; হা.নং ৩৫২১)

- এক যামানায় ইমাম বসে নামায পড়ালে মুক্তাদির জন্যও বসে ইক্তিদা করার হুকুম ছিলো। উযর থাক বা না থাক। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন ইমাম উযরের কারণে বসে নামায পড়ালে মুক্তাদি বিনা উযরে বসে ইক্তিদা করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুধবার থেকে সোমবার পর্যন্ত অসুস্থ থাকার পর ১লা রবিউল আউয়ালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের বছর ১২ই রবিউল আউয়াল কোনভাবেই সোমবার পড়ে না। সমাজে ভুলটাই বেশি প্রসিদ্ধ। এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের সময় মসজিদে তাশরীফ এনে বসে নামায পড়ালেন। আওয়ায এত ক্ষীণ ছিলো যে, হযরত আবু বকর রাযি. কে মুকাব্বির বানিয়ে নিজের সাথে দাঁড় করালেন। বাকী সাহাবীরা পিছনে দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করলেন। এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

একটি যুক্তিনির্ভর উদাহরণ

ডাক্তার রোগীর অবস্থাভেদে প্রথমবার এক ঔষধ, দ্বিতীয়বার ভিন্ন ঔষধ, তৃতীয়বার পরিবর্তন করে নতুন ঔষধ লেখে। প্রথম দুই প্রকারের ঔষধ ভুল ছিলো না। তখন সেটাই ঠিক ছিলো। কিন্তু তৃতীয়বার প্রেসক্রিপসনের পরও রোগী পূর্বের ঔষধ খেতে থাকলে সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতাই বাড়তে থাকবে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবস্থার পরিপেক্ষিতে সময়ে সময়ে হুকুম আহকাম পরিবর্তন করেছেন। শেষ হুকুম নাযিল হওয়ার পরও কোন ব্যক্তি পূর্বের হুকুম মানতে থাকলে তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোটকথা দ্বীনের বিধি-বিধানগুলো ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত হয়েছে। সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত হুকুমকে সুন্নাত বলা হয়। এ ধরণের সুন্নাতই আমলযোগ্য। আর শুরু যামানার রহিত হুকুমগুলোকে শুধুই হাদীস বলা হয়। সুন্নাত বলা হয় না। বর্তমানে এসকল হাদীসের উপর আমল করা নাজায়েয। হাদীসের কিতাবসমূহে নবুওয়াতের তেইশ বছরের সকল আমলই উল্লেখ করা হয়েছে। অমুক আমলের ব্যাপারে এটি প্রথম, এটি শেষ এভাবে সুবিন্যস্ত করে হাদীস ও সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য হাদীসের কিতাবাদিতে করা হয়নি। কাজেই সাধারণ পাঠকদের জন্য 'হুকুম-আহকাম' সম্বলিত হাদীসের গ্রন্থাবলী যেমনঃ বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি পাঠ করা উচিত নয়; বরং তাদের উচিত 'ফাযায়েল সম্বলিত' হাদীসের গ্রন্থাবলী যেমন ফাযায়েলে আমাল, রিয়াযুস সালিহীন, তারগীব-তারহীব ইত্যাদি পাঠ করা, আর আমলের ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখা। এর বিপরীতে তারা যদি হক্কানী উলামায়ে কেরামের উপর আস্থা হারিয়ে আমলের জন্য হাদীসের কিতাবাদির অনুবাদের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন, তবে এর দ্বারা তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হবেন, তেমনি সমাজের মধ্যেও গোমরাহী আর ভ্রষ্টতার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হবেন।

বর্তমানের আহলে হাদীস ভাইদের অবস্থা

আমাদের কিছু ভাই কেবল বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফের বাংলা অনুবাদ দেখে আমল করে। তাদের 'ইসলাম রিসার্চ' কেবল অনুবাদ নির্ভর হওয়ায় তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হয়, তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ করে। শুধু তাই নয়; কিছু ভাই তো 'অল্প বিদ্য ভয়ঙ্কর' এ প্রবাদ ভুলে গিয়ে মসজিদে এসে রীতিমত ইমাম সাহেবানদের সাথে তর্ক জুড়ে দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এটা যে, কত বড় অনাধিকার চর্চা, তা তারা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না। এ ভাইদের মধ্যে যাদেরকে যতটা 'ইলমধারী' মনে করা হয়, তারা হাদীসের অপব্যাখ্যা করতে ঠিক ততটা পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তাদের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার একটি দৃষ্টান্ত হলো, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা কাতারে দাঁড়ানোর সময় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে'। মিলানোর অর্থ হলো কাতার সোজা রাখা, পা আগে পিছে না করা। আহলে হাদীস ভাইয়েরা অর্থ করে, একজনের পা অন্যের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে, 'তোমরা নামাযের কাতারে দু'জনের পায়ের মাঝে জুতা রাখবে না। সেখানে ফেরেশতারা দাঁড়ায়'। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৬৫৪)

আহলে হাদীস ভাইদের ব্যাখ্যা মানা হলে দু'জনের মাঝে জুতা রাখার জায়গাও থাকে না, কাতারে ফেরেশতাদের দাঁড়ানোর ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদও ঠিক থাকে না। মূলত তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে।

অধিকাংশ আহলে হাদীস ভাই আরবী বুখারী শরীফ দেখেইনি; অনুবাদই তাদের সম্বল। নাসেখ মানসূখের (হাদীস রহিত হওয়া-বহাল থাকার) বিষয়টি হয়ত কখনো শোনেইনি। তাদের ধারণা অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র তারাই সহীহ হাদীসের সমঝদার। এগুলো ইংরেজদের তৈরি ফিতনা। শুরুতে গাইরে মুকাল্লিদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ইংরেজ গভর্নরের নিকট আবেদন করে 'আহলে হাদীস' নাম মঞ্জুর করেছিলো। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ফাতওয়া দিয়েছিলো, 'ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজ সরকার খোদার রহমত এবং এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম'। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 'মাযহাব ও তাকলীদ' নামক বইয়ে আমি লিখেছি।

সারকথা, কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার পদ্ধতি হলো, 'সুন্নাহ' তথা সর্বশেষ নাযিলকৃত হুকুমের উপর আমল করা। এ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কেবল অনুবাদ নির্ভর জ্ঞান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন এবং সহীহ সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা ইসমাতুল্লাহ
শিক্ষার্থী, ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

সমসাময়িক প্রসঙ্গ

শাহপরীর দ্বীপে : রোহিঙ্গাদের পাশে

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম। নবী-রাসূলগণের মধ্যে আবার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাকের নিয়ম হচ্ছে, তাঁর নিকট যে যত প্রিয় তাকে তিনি তত বেশি বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবতে আক্রান্ত করেন। দুনিয়ার নায-নিয়ামত ভোগ-বিলাস থেকে তত বেশি দূরে রাখেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা নবীজীর জীবনীতে দেখতে পাই।

অনুরূপভাবে পৃথিবীতে যত জাতি-গোষ্ঠী আছে তার মধ্যে আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত হচ্ছে মুসলিম জাতি। জান্নাতের সমস্ত নিয়ামত এই জাতির জন্যই আল্লাহ তা'আলা রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছেন। সুতরাং দুনিয়াতে মুসলিম জাতিকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হবে, বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরোতে হবে, দুর্গম-বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে এটাই স্বাভাবিক। সারা পৃথিবীব্যাপী আজ যে মুসলিম নিধন চলছে, অত্যাচারের স্টিমরোলার চলছে তার মূলেও এই হিকমত নিহিত রয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমান শুধু মার খেতে থাকবে আর জান্নাতের অপেক্ষা করতে থাকবে। ঘরে বসে বসে মার খেলে হবে না। এই মারটা খেতে হবে জিহাদের ময়দানে, তাবলীগের লাইনে, দীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে। সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন জিহাদের ময়দানে। অত্যাচারিত হয়েছেন হক কথার প্রচার করতে গিয়ে। আমরাও যদি এই পথ বেছে নিয়ে মার খাই, ঘর-বাড়ি ছাড়া হই, তাহলে সেই মার খাওয়াতে সার্থকতা আছে। আল্লাহ পাকের নিকট এর বিনিময় এত বিশাল যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

# # #

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত হচ্ছে ইহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ আর নাস্তিকদের হাতে। বসনিয়া, হার্জেগোভিনা আর কসোভোর মুসলমানরা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে যে নিধনযজ্ঞের শিকার হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। কিন্তু সুখের বিষয়, এই কষ্টের বিনিময়ে তারা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ করেছে।

ফিলিস্তিনী মুসলমানরা সেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার খাচ্ছে ইহুদীদের হাতে। তাদেরকে সাহায্য করছে কাফের-বিশ্ব। কিন্তু তবুও স্বস্তির বিষয় এই যে, তাদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আছে, পায়ের তলায় এক টুকরো যমীন আছে।

চেচনিয়া আর দাগিস্তানের মুসলমানরা মার খাচ্ছে সেই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কিন্তু তাদেরও একটা ঠিকানা আছে।

দখলকৃত কাশ্মীরী মুসলমানরা মার খাচ্ছে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তবে তাদেরও একটা প্লাটফর্ম আছে।

কিন্তু আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানরা মার খাচ্ছে সেই ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বার্মায় সামরিক জান্তা যখন থেকে ক্ষমতায় তখন থেকে সূচনা এই নির্যাতনের। কিন্তু তাদের মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই নেই, পায়ের নিচে কোন যমীন নেই, স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। মাত্র ২০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানের ১০ লাখ বাস করছে বাংলাদেশে, ২ লাখ সৌদি আরবে, ১ লাখ মত মালেশিয়ায় আর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খোদ মায়ানমারের একটি আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে প্রায় লক্ষাধিক মুসলিম। সেখানে ত্রাণ পৌঁছতে দেয়া হয় না। মানবিক সুযোগ-সুবিধার কোন বালাই নেই। আরাকানে আর যে ২/৩ লাখ মুসলমান রয়ে গেছে তাদের খাদ্য-পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাজরগুলো বন্ধ, নিত্যপ্রয়োজীয় সব কিছুর সরবরাহ বন্ধ। সুতরাং তারাও এখন বাংলাদেশের পথে।

# # #

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আমার বয়স তখন আট কি নয়। তখন আমার খালু তাবলীগের মেহনতে গিয়েছিলেন রেঙ্গুনে। আর তখনই শুরু হয়েছিল মুসলিম নিপীড়ন। তিনি নিজ চোখে দেখে এসে আমাদেরকে বার্মার মুসলমানদের নির্যাতন ভোগের কারগুযারী শুনিয়েছিলেন। কিভাবে মায়ের কোল থেকে শিশু বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, কিভাবে গর্ভবতী মায়ের পেট চিরে ভ্রূণ বের করে ফুটবল বানানো হচ্ছে, কিভাবে তাবলীগ জামাআতের লোকদেরকে বাস থেকে নামিয়ে প্রকাশ্যে হত্যা করা হচ্ছে তার কিছুটা ধারণা সেই সময়ে কচিমনে বসে গিয়েছিল। এরপরে যখন দারুল উলূম দেওবন্দে গেলাম ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে, তখন সেখানে আমাদের উস্তাদ ছিলেন মুফতী শাব্বীর আহমাদ দা.বা.– যিনি এখন শাহী মুরাদাবাদের প্রধান মুফতী– তার কাছে শুনেছিলাম রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতনের করুণ কাহিনী। তিনি বলছিলেন, মুসলিমরা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে পারে না। গেলে গ্রামপ্রধান যে কিনা 'মগ' তার লিখিত অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। মুসলমানরা কষ্ট করে মাঠে ফসল ফলায়; কিন্তু পাকার পর সেগুলো কেটে আর্মি ক্যাম্পে দিয়ে আসতে হয়। মেয়েরা ষোল বছরে পদার্পণ করলে বিবাহের আগে তাদেরকে সেনা ক্যাম্পে রেখে আসতে হয়। এই মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে গিয়ে কত মুসলমানকে জীবন দিতে হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। মেয়ে যখন বড় হয়েছে আর তাকে সেনা ক্যাম্পে পাঠানো হয়নি, তখন সেনারা খবর পেয়ে মেয়ের সাথে মেয়ের পিতাকেও ধরে নিয়ে গেছে। এরপর সে চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে গেছে।

এসব ঘটনা শুনতে শুনতে অন্য এক জগতে হারিয়ে যেতাম; কল্পনার চোখে আকিয়াব, রাখাইন, মংডু এসব এলাকা দেখার চেষ্টা করতাম। মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতাম। এরপরেই তো একের পর এক ঘটতে লাগল মুসলিম বিশ্বের উত্থান-পতনের ঘটনা।

# # #

গত বছর যখন রোহিঙ্গাসঙ্কট শুরু হয়েছিল এবং প্রায় লাখ খানেক রোহিঙ্গা

মুসলমান বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল, তখন তাদের অবস্থা শোনার জন্য, দেখার জন্য, কিছুটা সাহায্য করার জন্য টেকনাফ রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু তখন সরকারিভাবে অনুমোদন না থাকায় কক্সবাজার থেকেই ফিরে আসতে হয়েছিল। এবার যখন আবার রাখাইনে গণহত্যা শুরু হলো, লাখ লাখ নির্যাতিত মুসলমান একটু আশ্রয়ের সন্ধানে, একটু খাবারের সন্ধানে ছুটে এলো বাংলাদেশে, সরকারও তাদেরকে জায়গা দেয়ার ব্যাপারে উদারতা দেখাল, তখন সহযোগিতা, সমবেদনা, সহমর্মিতা, ও সহানুভূতির এক অনুপম নজির প্রত্যক্ষ করল পৃথিবীবাসী।

ঠিক আজ থেকে ১৪৩৮ বছর আগে মক্কার নির্যাতিত মুহাজির মুসলিমদেরকে মদীনার লোকেরা আনসার হয়ে যে সমবেদনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল তার নমুনা আবারো দেখল সমগ্র বিশ্ব। সারা দেশ থেকে আলেম-উলামা, ছাত্র-তলাবা, ইমাম-মুআযযিন, তাবলীগের সাথী ভাইয়েরা, সাধারণ জনগণ ছুটে এল যার যা আছে তাই নিয়ে। তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাতে সাহায্য করল। বখাটেদের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হল। রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য ছাপড়া তুলতে সহযোগিতা করল। এনজিওরাও ছুটে এলো; কিন্তু তাদের মতলব খারাপ। তারা বাড়ি-ঘরহারা ভগ্ন হৃদয় এই মানুষগুলোর অসহায়ত্বকে পুঁজি করে নিজেদের ব্যবসা ফুলিয়ে ফাপিয়ে নিতে চায়। তারা এদের সবচেয়ে দামী সম্বল ঈমানকে কেড়ে নিতে চায়। খ্রিস্টান বানাতে চায়। এদের কোমলমতি বাচ্চাদেরকে বিনোদনের নামে নাচ-গান শেখাতে চায়। যেমন হয়েছে মুছনী ক্যাম্পে এবং লেদা ক্যাম্পে। কিন্তু উলামায়ে কেরাম ছুটে এলেন এই ভেবে যে, এরা ঘর-বাড়ি ছাড়া হয়েছে হোক, এরা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে হোক, এরা লতাপাতা খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছে কাটাক; কিন্তু এদের ঈমান যেন ছিনতাই না হয়ে যায়। সম্পদহারা হওয়ার চেয়ে ঈমানহারা হওয়া তো আরো বেশি বিপদের। চিরস্থায়ী জাহান্নাম যেন এদের ঠিকানা না হয়, তাই তারা পাহাড়ে পাহাড়ে কোদাল চালিয়ে মাটি সমান করে তারা গড়ে তুললেন মসজিদ। একটি দু'টি নয়; শত শত মসজিদ। আর গড়ে তুললেন মসজিদকেন্দ্রিক মকতব। মসজিদ থেকে আযান হলো। সেই আযানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে-পাহাড়ে, টিলায় টিলায়। শত শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, তরুলতা আযানের আওয়াজে যেন খুশিতে ঝুমতে লাগল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদগুলো মুসল্লীতে ভরপুর। সকালে প্রতিটি মসজিদে পাঁচ/ছয়শত করে বাচ্চা নূরানী কায়েদা নিয়ে বসে গেছে। মেয়েদের মাথায় হিজাব, ছেলেদের মাথায় টুপি। সে এক নূরানী জান্নাতী পরিবেশ। তারা যখন সুর করে নূরানী কায়েদা পড়তে লাগল, তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করা আনসার ভাইয়েরা নিজেদের সব কষ্ট ভুলে গেল।

# # #

৯ই মুহাররম শনিবার। আমরা কয়েকজন রওয়ানা হলাম কিছু ত্রাণ সামগ্রী আর টাকা-পয়সা নিয়ে। কক্সবাজার হয়ে মেরিন ড্রাইভ দিয়ে যখন টেকনাফের দিকে যাচ্ছি, তখন ইনানী বীচের কাছাকাছি গিয়ে ড্রাইভার উসমান ভাই গাড়ি থামালেন। রাস্তার পাশের সবুজ ঘাস দেখে বললেন, গত পরশু মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থী বোঝাই একটি ট্রলার ঐ যে দেখা যায় সামনে, ওখানে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেছে। এতে প্রায় ত্রিশ জন নারী ও শিশু ডুবে মারা গেছে। মৃত উদ্ধার হওয়া কয়েকটি শিশুকে এই যে এখানে ঘাসের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, শিশুগুলো খেলতে খেলতে এইমাত্র ঘুমিয়ে গেছে। কেমন হাস্যোজ্জ্বল তাদের চেহারা। মৃত বলে মনেই হয় না। উসমান ভাইয়ের বর্ণনা শুনে আমাদেরও চোখ ছলছল করে উঠল। যে শিশুগুলো মারা গেল হয়ত তাদের পিতা-মাতা কেউ নেই; কে কাঁদবে তাদের জন্য। মায়ের নাড়ি ছেড়া ধন, সে-ও আজ কাছে নেই; কে কাঁদবে এই এতীম রোহিঙ্গাদের জন্য। ইহুদী-খ্রিস্টানরা তো কাঁদবে না। মুসলমানদের লাশ দেখে তারা ভেতরে ভেতরে উল্লাস করছে। মুসলমানকে জীবিত পুড়িয়ে মেরে তারা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠছে। তাদের জন্য কাঁদলে কাঁদবে মুসলমানের হৃদয়। মুসলমান তো মুসলমানের ভাই। একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মত। এক অঙ্গে ব্যথা হলে সব অঙ্গ তা সমানভাবে অনুভব করবে। কিন্তু মুসলমান আজ সেই অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। ভাইকে মরতে দেখে তার কান্না আসে না। বোনকে ধর্ষিতা হতে দেখে তার রক্ত টগবগ করে ওঠে না। মজলুমানের আর্তচিৎকার শুনে তার জিহাদী জযবায় ঢেউ ওঠে না। আমার দেশের মন্ত্রী চাল কেনার জন্য ঐ খুনি জান্তার শরণাপন্ন হয়। সৌদি বাদশাহ ব্যবসা ঠিক রাখার জন্য রাশিয়ার সাথে বৈঠক করে।

যাই হোক, গাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে খোলা আকাশের নিচে অনেক রোহিঙ্গাকে শুয়ে-বসে থাকতে দেখলাম। দু'দিন আগে এদেরও ঘর-বাড়ি ছিল, জমি-জায়গা ছিল, গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গরু ছিল; কিন্তু এখন খালি যমীন তাদের বিছানা আর খোলা আকাশ তাদের ছাদ।

টেকনাফ পৌঁছতে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। ইশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

চারিদিকে সুনসান নীরবতা। সুপারি বাগানের ভিতর বাড়ি। নতুন জায়গা; ঘুম হলো না। শুয়ে শুয়ে কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম বর্মী সেনা আর মগদস্যুরা মুসলমানদের ঘর-বাড়িতে আগুন দিচ্ছে। আর পিতা-মাতা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে ঘরের পিছন দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে বলছে, বাছারা! তোরা পালিয়ে যা। আমরা মরলে মরি, তোরা বেঁচে থাক। তোরা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাক। পরে বাংলাদেশে চলে যাবি। আহ! কি করুণ দৃশ্য! কাঁদো, মুসলিম জাতি আজ কাঁদো; মজলুম মুসলমান ভাইদের জন্য কাঁদো।

# # #

১০ই মুহাররম রবিবার। ফজরের নামায পড়েই আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম শাহপরীর দ্বীপে। টেকনাফ থেকে দূরত্ব ১২ কি.মি.। দ্বীপ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একসময় পিচঢালা রাস্তা ছিল। সরাসরি সেখানে গাড়ি যেত। কিন্তু সাগরের ঢেউয়ে সে রাস্তা এখন আর অক্ষত নেই। ৭ কি.মি. গিয়েই রাস্তা শেষ। বাকি ৫ কি.মি. চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। এখান থেকে ট্রলারে কিংবা স্পিডবোটে যেতে হবে। আমরা ট্রলারে গেলাম। রাস্তা ভেঙ্গে গেলেও বিদ্যুতের লাইন এখনো ঠিক আছে। ফলে

দ্বীপবাসী এখনো বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে। দ্বীপটি আগে বেশ বড় ছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বসবাস ছিল এখানে। এখন ভাঙতে ভাঙতে ছোট হয়ে গেছে। লম্বায় সাত কি.মি. আর চওড়ায় পাঁচ কি.মি.। লোকসংখ্যা বিশ হাজারের মত। ট্রলার থেকে নেমে সি.এন.জিতে গেলাম এখানকার সবচেয়ে বড় মাদরাসা বাহরুল উলূমে। এখানে আরো কয়েকটি মাদরাসা আছে।

আরাকানের নির্যাতিত মুসলমানরা বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেও শাহপরীর দ্বীপ দিয়ে তাদের আগমন একটু বেশি। মাছ ধরা ট্রলারে নাফ নদী পার হয়ে এই দ্বীপে এসে তারা নামে। রাত নয়টার পর থেকে তাদের আগমন শুরু হয়, চলে ভোর রাত পর্যন্ত। বাংলাদেশী জেলেরা মাছ ধরার নামে ওপারে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসে। এজন্য মাথাপিছু একহাজার টাকা করে দিতে হয়। ওপার থেকে আসার সময় মুসলমান দালালদেরকে দিতে হয়, মগদেরকে দিতে হয়, এমনকি অনেক সময় বর্মী বাহিনীকেও দিতে হয়। এভাবে বাংলাদেশে পৌঁছতে পৌঁছতে তারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা যা কিছু নিয়ে আসে সব শেষ। অনেকে গরু নিয়ে আসে, যার দাম প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ হাজার টাকা। কিন্তু এপারে তা পাঁচহাজার টাকা দিয়ে কিনে রাখে মুসলিম নামধারী ব্যক্তিরা। বকরীটি পাঁচশ/ছয়শ টাকা দিয়ে, লাখ টাকার স্বর্ণের অলঙ্কার দশহাজার টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। এভাবে রোহিঙ্গাদেরকে কেন্দ্র করে বিশাল এক বাণিজ্য সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে।

# # #

মাদরাসা বাহরুল উলূমে পৌঁছে দেখি উলামায়ে কেরাম এবং তাবলীগী সাথীদের মিলনমেলা। এমন অনেক উলামায়ে কেরামের সাথে মুলাকাত হল যাদের সাথে ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও গত দুই/তিন বছর যাবত দেখা হয়নি। তারা রাতভর এখানে এসব মুহাজির মুসলমানদের খিদমত করার চেষ্টা করছেন। একেকজন মুহাজির আট/দশদিন পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। পথে পানি ছাড়া কিছু জোটেনি। অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে পথিমধ্যেই মারা গেছে। অনেকের তিন বছরের পাঁচ বছরের বাচ্চা কচি পায়ে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে না পেরে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পিতা-মাতা তাদেরকে দাফনও করতে পারেনি। জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে। আসার সময় তারা দেখতে পেয়েছে রাস্তায়, জঙ্গলে, মাঠে, পাহাড়ে শত শত লাশ। কোনটা জবাই করা, কোনটা আগুনে ঝলসানো, কোনটা শিয়াল-কুকুরে খাওয়া, লাশ পঁচা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

এক যুবক তার আশি বছর বয়সী পিতাকে চেয়ারে বসিয়ে বাঁশের সাথে ঝুলিয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে। তার কাঁধ ক্ষত হয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। সাত বছরের এক ছেলে তার তিন বছর বয়সী বোনকে কাঁধে নিয়ে সাতদিন হেঁটে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। বাপ-মা কেউ বেঁচে নেই। বার্মার মুসলমানরা ধর্মপ্রাণ, মা-বোনেরা পর্দানশীন। কিন্তু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার কারণে বোরকাটা বের করার সুযোগও পায়নি তারা।

বাহরুল উলূমে পৌঁছে দেখি শত শত মজলুম মুসলমান মাদরাসার চত্বরে বসা। আজ রাতেই তারা সীমান্ত পার হয়ে এসেছে। প্রতি রাতে এভাবে তারা আসছে; হাজার হাজার। এই মাদরাসাকে অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্প বানানো হয়েছে। সকাল আটটায় বিজিবি এসে এদেরকে নিয়ে টেকনাফে অবস্থিত সেনাক্যাম্পে হস্তান্তর করে। সেখান থেকে তাদেরকে বালুখালী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মাদরাসায় প্রবেশ করার সময় তাদেরকে এক প্যাকেট বিস্কুট, একটা জুস, একটা কেক দেয়া হয়। আট/দশদিন পর এই প্রথম তাদের মুখে কিছু দানাপানি পড়ে। এরপর গোশত-ভাত দিয়ে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। এই দায়িত্ব পালন করছে পুরান ঢাকার তাবলীগের সাথীরা। তারা প্রতিদিন একটা করে গরু জবাই করে তাদেরকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে। উলামায়ে কেরাম ঘুরে ঘুরে কপর্দকহীন এই মানুষগুলোর হাতে নগদ টাকা তুলে দিচ্ছে। যা আগামী দিনগুলোতে তাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। আমরাও ঘুরে ঘুরে সকলকে কিছু কিছু দিলাম।

কোথায় আজ মানবতা! কোথায় মানবতার ধ্বজাধারীরা!? দু-চারটা ইহুদী-খ্রিস্টানের রক্ত যদি এভাবে ঝরত তাহলে সারা বিশ্ব মানবতা গেল, মানবতা গেল বলে চিৎকার তুলে দিত। জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ হত। আর দু-চার মাসের মধ্যেই পূর্বতিমূর কিংবা দক্ষিণ সুদানের মত স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু আরাকানে সেই ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তো ঝরছে মুসলমানের রক্ত। এরা তো মানুষ না; মুসলমান! তাই তাদের রক্তে নাফ নদীর পানি লাল হয়ে গেলেও বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয় না। তারা তো ব্যবসা বোঝে, নিজেদের স্বার্থ বোঝে। তাই পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করতে তাদের বিবেকে বাধে না। আরাকানের মাটির নিচের অফুরন্ত খনিজ সম্পদ আজ আরাকানী মুসলমানদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীন, ভারত, রাশিয়ার শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে এই সম্পদের উপর। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব আজ নীরব কেন? তাদের কুম্ভকর্ণের ঘুম কি আজো ভাঙবে না!

অবশ্য আজ আমাদের সময় এসেছে আত্মসমালোচনা করারও। মুসলমানদের আল্লাহ পাকের ওয়াদা রয়েছে, যদি তোমরা দীনের সাহায্য কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে সাহায্য করব। দীনের মেহনত ছাড়া আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়া যাবে না। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই মুসলমান তার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসে মেতে উঠেছে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের সতর্ক করার জন্য কখনো চেঙ্গিস খাঁ, কখনো হালাকু খাঁ, কখনো ফার্ডিন্যান্ড, আবার কখনো ইংরেজদের মত জালিমদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করলে আমাদের পরিণতিও যে এ রকম হবে না সেটাই বা বলি কি করে?

সুতরাং রোহিঙ্গাদের এই দুরাবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়ানো যেমন আমাদের ঈমানী দায়িত্ব তেমনই আমাদের জন্য করণীয় হচ্ছে, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সমস্ত অলসতা আর ভোগ-বিলাস ঝেড়ে ফেলে দীনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহ পাক সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(০২ পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদকীয়

(মানবতা আজ কেন এতো অসহায়?)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

অর্থ : তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশু ছাড়া কিছুই নয়; বরং পশুর চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। (সূরা ফুরকান- ৪৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

অর্থ : নিশ্চয় তাওরাত-ইঞ্জিলের অনুসারী কাফের এবং মুশরিকরা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। তারা সৃষ্টির অধম। (সূরা বায়্যিনাহ- ৬)

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে কোন মুমিনের জন্য কাফেরদেরকে প্রকৃত মানুষ ভাবার সুযোগ রাখা হয়েছে কি? স্বীকার করি, অমুসলিমরাও মাঝে-মধ্যে মানবতার কথা বলে। দয়া-মায়া ও সততা-মমতা প্রদর্শন করে। এগুলো আসলে নিতান্তই সাময়িক। মুসলমানদের এতে বিভ্রান্ত হওয়ার যুক্তি নেই। বনের পশুরাও কখনো সাধুতা দেখায়, আবেগপ্রবণ হয়। গল্পে শোনা যায়, বনের বাঘিনীও মানবশিশুকে দুধ পান করায়। হতে পারে; কিন্তু এই দয়া-মায়া জীব-জন্তুর জাত-স্বভাব নয়। বেঈমানদের অবস্থাও ঠিক তাই। মুখোশ খুলে পশুমূর্তি ধারণ করতে ওদের মোটেও সময় লাগে না। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলে দু'দিনের ব্যবধানে ছয় লক্ষ লোক মেরে ফেলা, ভারতবর্ষে এসে ব্যবসায়ের নামে দু'শ বছর ধরে লুটতরাজ করা, শুকরের চামড়ায় ভরে ভরে হাজার হাজার আলেম-ওলামাকে পুড়িয়ে মারা, গাছে গাছে ফাঁসিতে লটকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া, আগাগোড়া মিথ্যা অভিযোগে ইরাক ও আফগানিস্তানের মত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া, গুজরাটে নিরাপরাধ মুসলমানদেরকে কেটে-পুড়িয়ে পাইকারী হত্যা করা, নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের ইয়াহুদী কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেয়া– এগুলো তো কথিত ভদ্র-সভ্যদেরই কাজ। এসব দেখে শুনেও ইয়াহুদ-নাসারা আর মালাউনদেরকে মানুষের কাতারে ফেলা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় কি? কাশ্মিরীরা মুসলমান না হয়ে অন্য জাতি হলে কবেই তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়া হতো। রোহিঙ্গারা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হলে কত আগেই সেখানে জাতিসংঘের শান্তি-মিশনের নিয়ন্ত্রণ চলে আসতো, পৌঁছে যেতো ন্যাটো জোট; মগদস্যুদের অনেক আগেই গর্তে ঢুকিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু মজলুম রোহিঙ্গারা মুসলমান বলে কথা! রোহিঙ্গাদের এই কিয়ামতসম বিভীষিকায় তাবৎ কাফেরগোষ্ঠির পক্ষ থেকে চলছে দায়সারা গোছের লিপ্সার্ভিস তথা ঠোঁটের জমা-খরচ আর কিছু ত্রাণ সামগ্রী– যার সাথে জুড়ে আছে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অসহায়ত্বের সুযোগে ধর্মান্তরের দুরভিসন্ধি। আজ পৃথিবীতে কাফেরদের নেতৃত্বাধীন যত সংঘ-সংস্থা আছে সবই আসলে হিংস্র জীব-জন্তুর কো-অপারেটিভ সোসাইটি। জালিমকে জুলুমের লাইসেন্স দেয়া আর মজলুমের হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়াই তাদের প্রধান কাজ। তাদের বেড়িসমূহের অন্যতম হল মুসলিমবিশ্বে নিযুক্ত তাদের দালাল নেতৃবৃন্দ। এ পর্যন্ত বারবার প্রমাণিত হয়েছে, গত শতাব্দী জুড়ে প্রায় গোটা মুসলিম উম্মাহর রক্ষক, পাহারাদার ও কর্ণধার নির্বাচিত হয়েছে ইয়াহুদ-নাসারা আর পৌত্তলিকদের পোষ্য ও পা-চাটা দালালেরা। পবিত্র কুরআনের ভাষায় কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। চাই তারা যত বিশ্বস্তই হোক না কেন। দেখুন, সূরা মায়িদার ৫১নং আয়াত। তারা মুসলমানদের প্রতিবেশী বা মিত্র হতে পারে; কখনো বন্ধু হতে পারে না। অথচ দালাল ও পোষ্যরা আজ কাফেরদেরকে মুসলমানদের শুধু বন্ধুই নয়; প্রভুর আসনে স্থান দিয়ে রেখেছে!

পবিত্র কুরআনের ভাষায় এ পরিণতির জন্য দায়ী হল, মুসলিম জনসাধারণের ত্রুটিপূর্ণ ঈমান ও বদ আমল। দেখুন, সূরা নূর ৫৫নং আয়াত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অন্ধকার মূলত মুসলমানের নিজ ঘরেই। মুসলমানদের ঈমান-আমলের সংশোধন না হলে তাদেরকে বেঈমান হিংস্র-হায়েনার শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেই হবে। এই পরিণতি থেকে কারো নিরাপদ থাকার আশা নেই। এটাই আল্লাহর বিধান। এ বিধান বিলম্বিত হতে পারে; রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

গ.

ঈমানদারদের জান-মাল মূলত আল্লাহ তা'আলার খরিদা সম্পত্তি। এই জান-মাল মুমিনদেরকে অর্পণ করা হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য নয়; আল্লাহর রাহে অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার জন্য। ঈমানদারগণ এগুলোকে হয়তো মানবরূপী হায়েনাদেরকে শায়েস্তা করার কাজে সসম্মানে ব্যয় করবে, নয়তো হায়েনাদের হাতে মজলুম হয়ে অপমানের সাথে ব্যয় করবে। প্রথম পন্থা উত্তম বটে; দ্বিতীয়টিও পরকালের বিচারে নিষ্ফল নয়।

গোটা মুসলিম উম্মাহর ঈমানী ও আমলী ত্রুটির কারণে রোহিঙ্গারা আজ জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর কুরবানী পেশ করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা এ মুহূর্তে অন্তত মালের কুরবানী পেশ করতে বাধ্য। সুযোগ থাকতেও যদি আমরা এ কুরবানী পেশ করতে ব্যর্থ হই তাহলে হাশরের ময়দানে আমাদেরকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সেদিন এই ধন-সম্পদ আমাদের জন্য অভিশাপ হবে। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন, ক্ষুৎ-পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ ইয়াতীম ও বিধবাদের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও যদি নিজেদের আরাম-আয়েশে একটু সংকোচন করে আমরা তাদের পাশে না দাঁড়াই তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে আমাদের নাম মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি কিংবা সুযোগ ও সামর্থ্য হলে লড়াই করবে এ মর্মে ইচ্ছাও পোষণ করেনি এবং এমতাবস্থায়ই মরে গেছে, সে এক ধরনের মুনাফিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯১০)

হে আল্লাহর বান্দারা! জেগে উঠো, একটু চিন্তা করো; যদি তোমরা মানুষ হও!

রোহিঙ্গা মুহাজিরদের পুনর্বাসন ভাবনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম

বার্মিজ সেনাবাহিনী আর মগদস্যুদের হাতে নির্মম গণহত্যা ও পাশবিক নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা মুহাজিরদের ঢল এখনো অব্যাহত আছে। প্রিয়জনের কাটা-পোড়া লাশ, লুণ্ঠিত জনপদ, ভস্মীভূত ভিটেবাড়ি আর জ্বলন্ত ক্ষেত-খামার পেছনে ফেলে প্রতিদিনই পালিয়ে আসছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা। একটুখানি নিরাপত্তা আর ইজ্জত রক্ষার তাগিদে গুলিবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, আহত নারী-পুরুষ, ধর্ষিতা মা-বোন আর অসহায় শিশুরা মরণপণ করে চলে আসছে বাংলাদেশে। উদ্বাস্তু বনী আদমের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়েছে বাংলাদেশ। এটা মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য। শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেয়ায় এবং সর্বস্তরের জনগণ একাত্ম হয়ে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসায় সে বৈশিষ্ট্য আরেকবার উজ্জ্বল হয়েছে বিশ্বদরবারে। বলতে গেলে গোটা বাংলাদেশ এখন কক্সবাজার-টেকনাফ অভিমুখী। খাদ্যদ্রব্য, অস্থায়ী তাঁবু, জরুরী ওষুধপত্র ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে প্রতিদিনই শরণার্থী শিবিরগুলোতে যাচ্ছে শতশত ট্রাক। শুরুতে এলোমেলোভাবে হলেও বর্তমানে সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ স্থানীয় প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় ত্রাণ কার্যক্রমে মোটামুটি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী আগে থেকেই বাংলাদেশে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা মুহাজির অবস্থান করছে। এবারের ঘটনায় নতুন করে যোগ হয়েছে আরও পাঁচ লক্ষাধিক। এই দশ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়া, অন্ন-বস্ত্রের যোগান দেয়া, আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা– বিশেষত একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে– চাট্টিখানি কথা নয়। বাংলাদেশ সুদৃঢ় মনোবল আর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথেই কাজটি করতে পেরেছে এবং করে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে কত দিন, কত দিন পারবে বাংলাদেশ?

ঘটনাপ্রবাহের যে গতিপ্রকৃতি তাতে সহসাই রোহিঙ্গারা তাদের স্বদেশভূমি আরাকানে ফিরে যেতে পারবে কিংবা রাতারাতিই এই সমস্যাটির গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়ে যাবে তা মনে হচ্ছে না। কেউ কেউ ভাবছেন, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে শেষতক মগদস্যুরা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। সম্ভবত তারা অবাস্তব কল্পনা করছেন। গত অর্ধশত বছরের রোহিঙ্গা ইতিহাস সে কথা বলে না। তাড়া খেয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে একবার যারা নাফ নদ পেরিয়েছেন তারা আর কখনও ফিরে যাননি। ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কিংবা ফিরে যেতে দেওয়ার জন্য তো আর মেরে কেটে তাড়িয়ে দেয়া হয় না! হ্যাঁ, ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শক্ত অবস্থানের কারণে কিছু রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল বটে কিন্তু এর জেরে কিছুদিনের মধ্যেই নাগরিকত্ব হারিয়ে গোটা রোহিঙ্গাজাতিকে তার খেসারত দিতে হয়েছিল; জন্মভূমিতেই তারা পেয়েছিল বহিরাগত-র তকমা। তাছাড়া রোহিঙ্গা ইস্যুতে আঞ্চলিক শক্তিধর ও পরাশক্তিগুলোর ভাবগতিক দেখলে সহজেই বোঝা যায়, রোহিঙ্গাদেরকে আর কখনও তাদের স্বদেশভূমিতে ফিরতে দেয়া হবে না। বিভিন্ন কৌশলে শুধু সময়ই ক্ষেপণ করা হবে। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হতে পারে ইতিহাসের কোনও একসময় রোহিঙ্গারা আবারও তাদের বসতভূমিতে ফিরে যেতে পারবে, উপভোগ করতে পারবে স্বাধীনতার স্বাদ, কিন্তু সেটা কবে, কত বছর পর কেউ জানে না।

রোহিঙ্গারা তাদের দেশে ফিরে যাক বা না যাক যতদিন তারা আমাদের আশ্রয়ে আছে তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী সেবাদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা আমাদের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। এ নিয়ে আমাদেরকে আমাদের মত করেই ভাবতে হবে। আঞ্চলিক শক্তিধর কিংবা পরশক্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে কোন লাভ হবে না।

পুনর্বাসন চিন্তা : যত কিছুই হোক, শরণার্থী রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আমাদের প্রথম এবং এক নম্বর কাজ হবে তাদেরকে সসম্মানে আরাকানে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা, স্বাধীনদেশে স্বাধীনভাবে বাঁচা-মরার ব্যবস্থা করে দেয়া। এর জন্য আমরা দু'ভাবে অগ্রসর হতে পারি।

এক. অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সারাবিশ্বে রোহিঙ্গাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। তারপর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও যাবতীয় নাগরিক অধিকার পুনর্বহালের শর্তে মিয়ামারের ক্ষমতাসীন ঘাতকদের ওপর রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে কার্যকর চাপ সৃষ্টি করা।

দুই. এটি সম্ভব না হলে রোহিঙ্গা যুবকদের বুকে চেপে থাকা স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ও অস্ত্র সরবরাহ করে স্বাধীন আরাকান রাজ্য গঠনের নিমিত্তে মুক্তিফৌজ গঠন করা এবং স্বাধীন আরাকানের অভ্যুদয় ঘটা পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখা। ঠিক যেমনটি করেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী ভারত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আত্মমর্যাদাশীল ও ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে গভীর কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। বলাবাহুল্য বিষয়টির সাফল্য ও ঝুঁকি নির্ণয় এবং এর সতর্ক বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের জনমত ও সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

সাময়িক পুনর্বাসন : উপর্যুক্ত যে পদ্ধতিতেই হোক রোহিঙ্গা মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার বা ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তাদেরকে মানবিক ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও সাময়িক পুর্নবাসন আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

সাময়িক পুনর্বাসন কার্যক্রমকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন : নবাগত মুহাজিরদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে অস্থায়ী তাঁবু, খাদ্য, বস্ত্র, আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসা ইত্যাদির জরুরী ব্যবস্থা করা। পর্যাপ্ত না হলেও এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারী ও সরকারী সাহায্য অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও ত্রাণ-সাহায্য আসছে। পলিথিনে ঘেরা ঝুঁপড়িতে

হলেও শরণার্থীদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হয়েছে। তিন বেলা না হলেও এক দু' বেলা খেয়ে কোনমতে তারা জীবন ধারণ করতে পারছে। সীমিত আকারে হলেও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে।

দুই. দীর্ঘ মেয়াদী পুনর্বাসন : বর্তমানে অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গা মুহাজিরগণ যেভাবে এবং যে পরিবেশে জীবন ধারণে বাধ্য হচ্ছে সেটাকে কোনভাবেই জীবন যাপন বলা যায় না। ঠেকায় না পড়লে আমরা গরু-ছাগলকেও এভাবে রাখি না বা থাকতে দেই না। অনোন্যপায় হয়েই মুহাজিররা এই মানবেতর জীবন মেনে নিয়েছে। মানুষের পক্ষে কোনমতেই এই পরিবেশ দীর্ঘ সময় বসবাসের উপযোগী নয়। ঝুঁপড়িগুলো বাঁশ-পলিথিনে চারদিক ঘেরা। এতোটাই নিচু যে, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। যাতায়াতের জন্য একদিকে যদিও একটু খোলা, তা-ও আবার আব্রু রক্ষার্থে কাপড় দিয়ে ঘেরা। দিনের বেলায়ও ভেতরে প্রায় গাঢ় অন্ধকার। আলো প্রবেশের পথ নেই, বাতাস প্রবাহের জানালা নেই। বিশুদ্ধ পানির চরম সঙ্কট। কোন কোন ক্যাম্পে প্রচুর টিউবওয়েল স্থাপিত হলেও অগভীর হওয়ায় পানিতে প্রচুর আয়রন। দু' চার মিনিটেই স্বচ্ছ পানি হলুদ বর্ণ ধারণ করে। সেনিটেশন ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে মলমূত্রের উৎকট দুর্গন্ধ। ঝুঁপড়ির সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নোংরা, পুতিগন্ধময় পানি। বৃষ্টি-বাদল হলেই টিলা-পাহাড়ের নিচু এলাকার ঝুঁপড়িগুলো তলিয়ে যাচ্ছে বুকসমান পানিতে। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসহায় মানুষের শেষ সম্বলটুকুও। একটু উঁচুতে যারা ডেরা বেঁধেছে সারাক্ষণ শঙ্কিত থাকে পাহাড়ধ্বসের। বাড়তি উপদ্রব হিসেবে আছে বন্যহাতির আক্রমণ। এই তো কয়েক দিন আগে বন্যহাতির আক্রমণে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছে চারজন শরণার্থী। পায়ের চাপে গুড়িয়ে গেছে বিশটি ঘর। তো এই আবদ্ধ, নিচু, অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে ঝুঁপড়িতে থাকতে থাকতে, এই ভীতিকর, অস্বাস্থ্যকর ও পুতিগন্ধময় পরিবেশে জীবন কাটাতে কাটাতে মুহাজির নারী-শিশুরা ইতোমধ্যেই মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাস খানেকের মধ্যেই জেঁকে বসবে শীত। তখন ডায়রিয়া, জ্বর, সর্দি, কাশি, হাপানী ও নিউমোনিয়াসহ ঠাণ্ডাজনিত অসুখ-বিসুখ বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। সৃষ্টি হবে চরম দুর্দশা। একপর্যায়ে এসব সাধারণ রোগ-ব্যাধিই প্রাণঘাতী হয়ে ধারণ করতে পারে মহামারীর রূপ। ফলে টিলায় টিলায় দেখা যাবে রোহিঙ্গা নারী-শিশুর সারি সারি নতুন কবর। এজন্য খুব শিগ্‌গিরই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যথাযোগ্য পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে। উপরন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার গর্ভবতী নারীর নিরাপদ প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা-শুশ্রূষারই বা উপায় কী হবে তারও ফিকির করা দরকার।

দীর্ঘ মেয়াদী পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আমাদের তিনটি পরামর্শ।

এক. পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে ১০০টি ক্যাম্প স্থাপন করে প্রতিটি ক্যাম্পে দশহাজার করে রোহিঙ্গাকে জায়গা দেয়া।

দুই. নোয়াখালী জেলার পার্শ্ববর্তী ভাসানচরে সকলকে একত্রে পুনর্বাসন করা।

তিন. যদি কখনও বা কোন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদেরকে কিছুতেই আর ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না মর্মে নিশ্চিত হওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সহজে ঝামেলামুক্ত হওয়ার জন্য নাগরিকত্ব প্রদান করে চেয়ারম্যান মেম্বারদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের সত্তুর হাজার গ্রামের প্রতিটিতে গড়ে পনেরো জন করে শরণার্থীকে ভাগ করে দেয়া।

বলাবাহুল্য, উপর্যুক্ত তিনটি প্রস্তাবের প্রতিটির ক্ষেত্রেই কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে।

রোহিঙ্গাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে তাদেরকে অনুগত ও সন্তুষ্ট রাখা গেলে– আবারও বলছি, তাদেরকে অনুগত ও সন্তুষ্ট রাখা গেলে বাংলাদেশ যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে সেটা হল, অশুভ শক্তির 'স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম' দেখার খায়েশ চিরতরে মিটে যাবে।

স্বীকার করি আর না করি বাস্তবতা হল, আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের শতভাগ ভূখণ্ড এখন আর আমাদের দখলে নেই। প্রতিবেশী ভারতসহ পশ্চিমাগোষ্ঠি স্বাধীনতার পর থেকেই এ অঞ্চলকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উপজাতিদের মানবিক সহায়তার ছদ্মবেশে তারা ধর্মান্তরের পসরা সাজিয়ে বসেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার এখনই মোক্ষম সময়। যদি পুরো পার্বত্য এলাকায় রোহিঙ্গাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া যায় তাহলে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে দূরদর্শিতার ভিত্তিতে সারা বাংলাদেশ থেকে বাঙালীদেরকে পাহাড়ে এনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন– যেটা বর্তমানে পাহাড়িদের তুলনায় বাঙালীদের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেকটাই অকার্যকর হয়ে পড়েছে– তা আলোর মুখ দেখবে। রোহিঙ্গাদের প্রতি সারাবিশ্বে যে সদয় অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যবহার করে কাজটি করা এ মুহূর্তে খুব একটা কঠিন হবে না। তা না করে যদি রোহিঙ্গাদেরকে লেদা-মুছনি ক্যাম্পের মত করে কক্সবাজার-উখিয়া-টেকনাফেই গাদাগাদি করে রাখা হয় তাহলে একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের হাতছাড়াও হয়ে যেতে পারে। কারণ, আজকের মজলুম রোহিঙ্গারা তাদের আপদকালের পরম বন্ধু বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সবসময়ই যে কৃতজ্ঞ থাকবে কিংবা তাদেরকে কৃতজ্ঞ থাকতে দেয়া হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ত্রাণকর্তার ওপর পরিত্রাণ লাভকারীর হাতিয়ার তোলার উদাহরণ ইতিহাসে দুর্লভ নয়। ইসরাঈল-রাশিয়া আর চীন-ভারতের মতো বন্ধুরা– যারা সীমাহীন ইসলামবিদ্বেষ থেকে এবং নিকৃষ্ট পুঁজিবাদী ধান্ধায় বার্মিজ সেনাবাহীনিকে অর্থ ও অস্ত্রের যোগান দিয়ে, প্রশিক্ষণ ও প্ররোচনা দিয়ে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করিয়েছে– শুধু বাংলাদেশে তাড়িয়ে দিয়েই তারা ক্ষান্ত দিবে এটা ভাবা ঠিক নয়। ইতিহাসের বরাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, একসময় এরা গাদাগদি করে ক্যাম্পের ভেতর মানবেতর জীবন যাপনকারী রোহিঙ্গাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। অধিকার বঞ্চনার প্ররোচনায় ক্ষোভ ও বিক্ষোভের মোড়কে কত সহজে একটি বাহিনীকে আরেকটি সুসংহত বাহিনীর বিরূদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যায়, বাঘা বাঘা সেনা অফিসারকে হত্যা করিয়ে একটা দেশকে সামরিক শক্তিকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে দেয়া যায়– বাংলাদেশের বিডিয়ার বিদ্রোহ তার জ্বলন্ত নমুনা। কিছুদিন পর

যখন রোহিঙ্গাদের ত্রাণে ঘাটতি পড়বে, তাদের পক্ষে জীবনের ঘানি টানা অসহনীয় হয়ে পড়বে তখন কেউ বা কোন গোষ্ঠি যদি তাদেরকে প্ররোচনা দেয় যে, বাংলাদেশকে তোমরা আশ্রয়দাতা ভেবেছো? তারা তো তোমাদের নাম ভাঙিয়ে বাণিজ্য করছে। তোমার জন্য সারা দুনিয়া থেকে আসা ত্রাণ তহবিলের এত এত বিলিয়ন টাকার কয় টাকা তুমি বুঝে পেয়েছো? বুঝলে হে, স-ব ধান্ধাবাজি! কিন্তু এখন তো আর তোমাদের আরাকানে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই; ওখানে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যু আর এখানে থাকলে ধীরে ধীরে। কাজেই এমনিতেও মরবে অমনিও মরবে। তার চেয়ে বরং চেষ্টা করে দেখো, এলাকাটা নিজেদের করে নিতে পারো কিনা? প্রিয় পাঠক! এটি কোন নাটকের সংলাপ নয়। আপাত কল্পিত মনে হলেও অধিকার আদায় আর গণতন্ত্র উদ্ধারের ছলনায় আরববসন্তের মোড়কে মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলোর উৎখাত-কৌশল সামনে রাখলে এটাকে অবাস্তব বলে মনে হবে না। তারপর আল্লাহ না করুন, যদি সত্যিসত্যিই রোহিঙ্গারা কিংবা তাদের নাম ব্যবহার করে কেউ আমাদের সেনাসদস্য কিংবা পুলিশের ওপর আক্রমণ করে বসে, নিহত হয় দু'চারজন সেনাসদস্য আর সেটি দমন করতে এগিয়ে যায় সেনাবাহিনী এবং তাতে প্রাণ যায় দশ-বিশজন রোহিঙ্গার– তখন কী হবে? এই যে বর্তমানে সারা দুনিয়ায় রোহিঙ্গাদের প্রতি একটা সদয় অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে এটাকে পুঁজি করে তখন ইসলামবিদ্বেষী পুঁজিবাদি দুনিয়া তিলকে তাল বানিয়ে মিডিয়ায় হৈচৈ ফেলে দেবে না যে, দ্যাখো, দেশ-খেশহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত শরণার্থীদের ওপর বাংলাদেশ সরকারের কী নির্মম আচরণ! পরপর এ ধরণের দু চারটি ঘটনা ঘটাতে পারলেই ওরা জিগির তুলবে– তাহলে এবার গণভোট দিয়ে দেখা হোক, রোহিঙ্গারা, পাহাড়ের অধিবাসীরা কী চায়? আর ১৯৭১ সাল থেকেই তো পার্বত্য এলাকাকে স্বাধীন খ্রিস্টরাজ্য বানানোর জন্য পার্বত্য এলাকাগুলোতে হাজার হাজার খ্রিস্টান মিশনারী কাজ করে যাচ্ছে। তারা কয়েক লক্ষ উপজাতিকে অলরেডি ধর্মান্তরিত করে ফেলেছে। ওদিকে সন্তুলারমা'র শান্তিবাহিনী তো এমন একটি পার্বত্য এলাকা পাওয়ার জন্যই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলাফল, পাহাড়বিহীন অরক্ষিত বাংলাদেশ। তুরস্ক ও ইরানের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও সাজানো গণভোটের মাধ্যমে কুর্দিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন এবং স্পেনের কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার ভোটাভুটি সাম্প্রতিককালে এর সর্বশেষ উদাহরণ। এজন্য বাংলাদেশকে অনেকটা আপদ দিয়ে বিপদ ঠেকানোর কাজ নিতে হবে। অর্থাৎ আপদকে সম্পদরূপে গড়ে তুলতে হবে এবং শত্রুর আক্রমণকে বুমেরাং-এর মত তারই দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা একটু জটিল বটে কিন্তু ধৈর্য ও মেধা খাটিয়ে এবং একটু হিসেব নিকেশ করে এগোলে তা অসম্ভব হবে না। একসঙ্গে জড়ো করে না রেখে রোহিঙ্গাদেরকে পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে এবং সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে বাংলাদেশের প্রতি সন্তুষ্ট রাখলে এরাই তখন সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালীদের সঙ্গে পাহাড়ী অঞ্চলের নিরাপত্তারক্ষী হবে, আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। আর অসুবিধা হল, উপজাতিরা এবং তাদের এদেশীয় দোসর কিছু এনজিও ও মাথাবেচা মিডিয়া এটা কিছুতেই মানতে চাবে না। তারা তাদের এতদিনের মেহনত এত সহজে জলাঞ্জলী যেতে দিবে না। সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামবে। কাজেই এ পদক্ষেপ নিলে কূটনৈতিক ও সামরিক সব পথেই বাংলাদেশকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সজাগ থাকতে হবে। উপজাতিদেরকে দেশের সাধারণ জনগণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আমরাও উপজাতিদের সুরক্ষা চাই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল জনগোষ্ঠী যেভাবে দেশের সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের আওতায় নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে এবং ভিন্ন কোন নিরাপত্তা বাহিনীর কল্পনা করে না তেমনি উপজাতিরাও সরকার ও জনপ্রশাসনের আওতায় নিরাপত্তা লাভ করুক। বিশেষ নিরাপত্তার নামে দেশী-বিদেশী চক্রের উস্কানিতে স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকার দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিক।

ভাসানচরে পুনর্বাসনের সুবিধা হল, একসঙ্গে রাখা হলে শরণার্থীদের দুরাবস্থার ওপর পুরো বিশ্বের নজর থাকবে। মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা যাবে। মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের বিদ্রোহ ইত্যাদির আশঙ্কা থাকবে না।

কিন্তু অসুবিধা হল, সব রোহিঙ্গাকে কোন এলাকায় একসঙ্গে রাখা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়। ভাসানচর সাগরে জেগে ওঠা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে সেখানে যেতে শ্যালো নৌকায় প্রায় ঘণ্টা দু' ঘণ্টার মত লাগে। পত্র-পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ভাসানচর এখনো বসতি গড়ার উপযোগী নয়। জোয়ারের সময় দ্বীপের বিরাট একটা অংশ তলিয়ে যায়। আর জলোচ্ছ্বাস হলে পুরো দ্বীপটাই পানির নিচে ডুবে যায়। ভাসানচরকে বসবাস উপযোগী করতে হলে পুরো চরের চারপাশ জুড়ে মজবুত বেড়িবাঁধ তৈরি করতে হবে। বেড়িবাঁধ না করে ভাসানচরে পুনর্বাসন করা হলে রোহিঙ্গাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারার নামান্তর হবে। উপরন্তু দশ/ পনেরো লাখ রোহিঙ্গার খাদ্যসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বহুদিন পর্যন্ত ত্রাণ-কার্যক্রম জারি রাখতে হবে। সবাই তো আর সাগরে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না। মাছ ধরতেও তো নৌকা-জাল ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। সুতরাং অবশ্যই এতগুলো মানুষের ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট জমিগুলোকে কৃষি উপযোগী বানাতে হবে। বেশকিছু শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হবে। গুরুতর অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য সাগর পেরিয়ে নোয়াখালীতে আসতে হবে। সর্বোপরি দেশের মূল ভূ-খণ্ড থেকে এতটা দূরে এতোটা ঝামেলা পোহানো আমাদের বিবেচনায় সহজসাধ্যও নয়, সমীচীনও নয়।

৭০ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার সুবিধা হল, সরকারকে এসব রোহিঙ্গার পুনর্বাসন নিয়ে খুব একটা ভাবতে হবে না। চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ গ্রামবাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থানীয় বিত্তশালীদের সহায়তায় খাস, পতিত অথবা দানকৃত জায়গায় এদের মাথাগোঁজার ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তাদের শিশুরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করবে। কিশোর-যুবারা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের ও যোগ্যতা মূল্যায়নের সুযোগ পাবে। এর জন্য বাংলাদেশের জনগণকে রাজি করাতেও

খুব একটা বেগ পেতে হবে না। কারণ বর্তমান বাস্তবতায় এদেশের জনগণ এমনিতেই রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়াকে মাসখানেক কাজে লাগালে কাজটি আরও সহজ হয়ে যাবে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে সংঘবদ্ধ কোন ঝুট-ঝামেলারও আশঙ্কা থাকবে না।

আর অসুবিধা হল, এভাবে নাগরিকত্ব ও ভিটেমাটির মাধ্যমে স্থায়ী হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির সঙ্গে একাকার হয়ে গেলে এদেরকে আর আলাদা করা সম্ভব হবে না। এমনকি রোহিঙ্গাদের মধ্যেও আর আরাকানে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ বজায় থাকবে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিয়ানমারের এত বড় একটা অন্যায়কে গোটা বিশ্ব বেমালুম হজম করে ফেলবে। বর্তমানে পরাশক্তিগুলো রোহিঙ্গাদের পক্ষে যে লিপসার্ভিসটুকু দিচ্ছে সেটাও তখন বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ সরকারও রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে না। বিদেশী সাহায্যকারীরাও হাপ ছেড়ে বাঁচবে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে তাদের সাহায্য সহযোগিতা বিলকুল গুটিয়ে নিবে। সর্বোপরি কখনও এসব শরণার্থীর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আসলে তাদেরকে জড়ো করা যাবে না। এভাবে একসময় রোহিঙ্গা নামটিই ইতিহাস থেকে মুছে যাবে। তবে রোহিঙ্গাদেরকে কিছুতেই ফেরত দেয়া সম্ভব হবে না মর্মে নিশ্চিত হয়ে গেলে সহজে ঝামেলামুক্ত হওয়ার এটাই মোক্ষম উপায়।

তবে পুনর্বাসনের জন্য যে স্থানই নির্বাচন করা হোক সর্বাগ্রে শরণার্থীদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ তাদের জন্য–

(ক) সম্মানজনক ও নৈতিকতা-বান্ধব বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শরণার্থীদেরকে তাঁবুর জীবন থেকে কমপক্ষে গুচ্ছগ্রামে উন্নীত করতে হবে। লেদা-মুছনি ক্যাম্পের মত ঘিঞ্জি করে রাখা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, বেশির ভাগ রোহিঙ্গা নারীই পর্দাপুশিদার জীবন যাপনে অভ্যস্ত। গাদাগাদি করে মুখোমুখি ঘরে যুবক-যুবতীদের বসবাস হাজারও অঘটনের জন্ম দেবে। পাশাপাশি ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সহজ ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সুদখোর মহাজনেরা কর্মসংস্থান ও গৃহনির্মাণ খাতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে কোন রোহিঙ্গাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) রুজি-রোজগার তথা জীবিকা নির্বাহের সহজ সুযোগ করে দিতে হবে। শরণার্থীদের কায়িক শক্তি, কৃষি ও শিল্পজ্ঞানের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমভিত্তিক জীবন যাপনের সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে জীবনধারণের যাতনায় কিছুদিনের মধ্যেই এরা মাদক পাচার, চোরাচালান, মদ-জুয়া এমনকি পতিতাবৃত্তির মত ঘৃণ্য পেশায় জড়িয়ে পড়বে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা যা কিনা তাদের বিতাড়িত হওয়ার মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে খুইয়ে বসবে। এজন্য কৃষিকাজে পারদর্শীদের মধ্যে ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী খালি ও পতিত জমিগুলো কৃষিকাজের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি ক্যাম্পের কর্মক্ষম নারী-পুরুষের অনুপাত অনুযায়ী প্রয়োজন সংখ্যক হালকা ও ভারী শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। শিল্প-কারখানার উদ্যোক্তা মালিকদেরকে আকর্ষণ করার জন্য ৫/১০ বছর পর্যন্ত করমুক্তভাবে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদানের পর নীট লভ্যাংশের ২০ শতাংশ রোহিঙ্গা-উন্নয়ন ফান্ডে, অবশিষ্ট ৩০ ও ৫০ শতাংশ যথাক্রমে সরকার ও মালিকদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। মৎসজীবিদেরকে সাগরে মাছ ধরার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। অন্যান্য পেশাজীবিদেরকে তাদের দক্ষতার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলা শহরে উপার্জনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা ও সহজ শর্তে কাজ পাওয়ার জন্য 'শরণার্থী নাগরিক' কার্ড বিতরণ করা যেতে পারে। দেশপ্রেমিক ও দীনদরদী বুদ্ধিজীবিগণ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আরও অনেক কর্মক্ষেত্র বের করতে পারবেন। এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য, রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে কর্মভিত্তিক সম্মানজনক জীবনে আগ্রহী করো তোলা এবং ত্রাণভিত্তিক জীবন যাপনে নিরুৎসাহিত করা।

(গ) সৎ জীবন যাপনের লক্ষ্যে নৈতিক ও জাগতিক তথা ধর্মীয় ও কারিগরি শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিলের পাশাপাশি তাদের শিক্ষাদীক্ষার অধিকারও হরণ করে রেখেছিল। রোহিঙ্গা শিশুরা বহু বছর ধরে স্কুলে যেতে পারতো না। আসলে তাদের জন্য কোন স্কুল বরাদ্দই ছিল না। এজন্য তারা নিজেরাই গ্রামাঞ্চলে পারিবারিকগুলে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা, আর শহরে/শহরতলীতে কওমী মাদরাসাভিত্তিক মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং সীমিত পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ধরে রেখেছিল। সম্ভবত তারা দুনিয়া বরবাদ হওয়ার পর আখেরাতকে হাতছাড়া করতে চাইছিল না। এই কওমী মাদরাসাগুলোও ছিল মগদস্যুদের কঠোর নজরদারীতে। অধিকারবঞ্চিত মানবগোষ্ঠিকে অধিকার সচেতন করতে পারে– কোন আলেম-তালিবে ইলমের ব্যাপারে এ সন্দেহ হলেই তাকে সেনাক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতো। এরপর আর সেই হতভাগ্যের কোন হদিস পাওয়া যেতো না। চেতনার বাতিঘর এই কওমী মাদরাসাগুলো সর্বাত্মক ঝুঁকি নিয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতি-নৈতিকতার ফসল ফলিয়ে যাচ্ছিল। শরণার্থীদের প্রাত্যহিক জীবনে নামায-কালাম, ভদ্রতা-শালীনতা ও নীতি-নৈতিকতাসহ ধর্মীয় জীবন যাপনের যতটুকুন এখনও পরিলক্ষিত হয় তা এরই ফসল। সামরিক জান্তা যা করেছে করেছে, এখন আগত শরণার্থীদের জাগতিক ও নৈতিক শিক্ষার দায়ভার আমাদেরকেই বুঝে নিতে হবে। শরণার্থীদের ধর্মীয় আবেগকে সম্মান জানিয়ে তাদের জন্য যুগপৎ ধর্মীয় ও কারিগরি শিক্ষাদীক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। মাশাআল্লাহ, অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরগুলোতে দেশের আলেম উলামা ও ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠির আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল মসজিদে রোহিঙ্গা শিশুরা বিনামূল্যে দু'বেলা প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। কোন কোন মসজিদ থেকে শিক্ষার্থীদের সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে অভিভাবকগণ একটি বেলা হলেও শিশুসন্তানের আহার যোগাড়ের ঝামেলা থেকে বেঁচে যাচ্ছে। একেকটি মসজিদে তিন-চার-পাঁচশ করে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে। এনজিওদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে নাচ-গান শেখার কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। খাদ্য-বস্ত্র সরবরাহের ঢোল পিটিয়ে যা-ও বা দু'চারজন পাওয়া যাচ্ছে সেটা অভিভাবকদের মনোতুষ্টির ভিত্তিতে নয়। বাস্তব অবস্থা না বুঝে কিংবা ক্ষুধার জ্বালায় অপারগ হয়েই কেউ কেউ নিজ সন্তানকে ওসব স্কুলে পাঠাচ্ছে। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন,

যতদিন না রোহিঙ্গাদেরকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হচ্ছে, শিশুশিক্ষার বীজতলা এসব মসজিদ-মক্তবকে আরেকটু বাড়িয়ে মাদরাসায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হোক এবং সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আপাত প্রয়োজনীয় জাগতিক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। বয়স্ক নারীদেরকে হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মময় জীবনে উদ্বুদ্ধ করা হোক। অতঃপর দেশের বিভিন্ন শহরের বড় বড় কওমী মাদরাসাগুলোকে একটা দু'টো করে মসজিদ-মাদরাসা-কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হোক। আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি, দেশের কওমী মাদরাসাগুলোর দায়িত্বশীলগণ এ আহ্বানে সন্তুষ্টচিত্তেই সাড়া দিবে এবং সরকারের ওপর কোন বোঝা না চাপিয়ে নিজেরাই এর ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। অতঃপর স্থানান্তর করা হলে সেখানেও এরকম বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় মসজিদ-মাদরাসা-শিক্ষালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হোক। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিদেশী এনজিওগুলো কোমলমতি শিশুদেরকে শিক্ষার নামে ধার্মিকতা ও নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত যেসব ছাইপাশ গেলাচ্ছে এবং সেবার আড়ালে উপজাতিদের ধর্মান্তরসহ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তা সরকারের অজানা নয়। আমরা চাই না, বিদেশী এনজিওগুলো উপজাতিদের মত রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকেও তাদের নিকৃষ্ট স্বার্থের বলি বানাক। এজন্য সরকারের উচিত হবে, কোনভাবেই শরণার্থীদের শিক্ষাদীক্ষার ভার ইউনিসেফ, গুড নেইবার, আশা, কারিতাস ও সেভ দ্য চিলড্রেন জাতীয় দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর হাতে তুলে না দেয়া। নিজ খরচে আমরা যখন পদ্মাসেতু নির্মাণ করতে পারছি, তিন-চার লাখ রোহিঙ্গা শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার ভারও আমরাই বহন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বিদেশী এনজিওদের কার্যক্রম মনিটরিং করে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পারতপক্ষে ক্যাম্পের ভেতরে তাদেরকে সরাসরি কাজ করতে না দিয়ে বরং দেশীয় জনবলকে কাজে লাগিয়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

(ঘ) সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে : অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। শরণার্থী শিবিরগুলোতে আরও গুরুত্বের সঙ্গে এ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশের বড় বড় ডাক্তারগণ এবং ওষুধ কোম্পানীর মালিকগণ ত্রাণ-কার্যক্রমে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে একটি করে কেন্দ্রীয় এবং কয়েকটি শাখা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করতে পারেন। সরকারী মেডিকেলের ডাক্তারগণ ৩০টি দলে বিভক্ত হয়ে পালাক্রমে এক/দুই মাস পরপর এক-দু'দিনের জন্য শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে গণচিকিৎসাসেবা প্রদান করতে পারেন। আশপাশের জেলাসমূহের অধ্যাপক চিকিৎসকগণ ইন্টার্নি ডাক্তারদেরকে অভিজ্ঞ করে তোলার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের ক্যাম্পেইনের জন্য শরণার্থী ক্যাম্পগুলোকে বেছে নিতে পারেন। ওষুধ কোম্পানীর মালিকগণ প্রতি মাসে জরুরী ওষুধপত্রের উল্লেখযোগ্য একটা পরিমাণ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে দান করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি ক্যাম্পে দৈনন্দিনের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য সরকারের তরফ থেকে দেশের সকল সরকারী ডাক্তারকে পালাক্রমে বছরে একবার সপ্তাহ/দশদিনের জন্য ক্যাম্পগুলোতে প্রেরণ করা যেতে পারে।

(ঙ) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে : রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলোতে অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত কিছু দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্নসংস্থানে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে ফুসলিয়ে নবজাতক শিশুদের কিনে কিনে পাচার করা হচ্ছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে বিয়ে ও আশ্রয়ের প্রলোভন দিয়ে নারীদেরকে শহরে এনে ধর্ষণ এবং পরবর্তিতে পতিতালয়ে পাচার করারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসা অলঙ্কার, গবাদি পশু ও প্রাপ্ত ত্রাণ পানির দরে খরিদ করে নেয়া হচ্ছে। ক্যাম্পগুলোতে চুরি-চামারির ঘটনাও ঘটছে অহরহ। সবকিছু মিলিয়ে শরণার্থীরা এগুলোকে 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' বিবেচনা করছে। এজন্য ক্যাম্পগুলোর নিরাপত্তাকল্পে সাধ্য অনুযায়ী পুলিশ ও সেচ্ছাসেবী মোতায়েনের ব্যবস্থাও করতে হবে। রোহিঙ্গারা অন্য কোন গ্রহের প্রাণী নয়। তারাও এই পৃথিবীরই মানুষ। কাজেই তাদের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ কোন্দল ঝগড়া-ঝাটি মারামারি হতে পারে, বিভিন্ন গোলযোগ দেখা দিতে পারে। এগুলো সামল দিতে সাধারণ বিচার-শালিসের এবং চরম অপরাধের ক্ষেত্রে দেশীয় আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় থাকতে হবে।

(চ) সাধারণ জনগণকেও পুনর্বাসন কাজে এগিয়ে আসতে হবে এবং ত্রাণসহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে জান-মাল নিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং এখনও আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা এককথায় অতুলনীয়। অসহায় রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার এ ধারা জনগণকে অব্যাহত রাখতে হবে। শক্তিশালী একটি ফান্ড গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি দেশের প্রতিটি সরকারী, বেসরকারী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত মসজিদ মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নেন, দেশের প্রতিটি মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী ব্যক্তিকে প্রতিদিনের বাজার খরচ থেকে ৩/৪টি টাকা করে বাঁচিয়ে প্রতি মাসে নূন্যতম ১০০ টাকা দান করার আহ্বান জানান, পাশাপাশি বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতাগুলোকে উপযুক্ত খাতে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, আমাদের বিশ্বাস পুনর্বাসনের জন্য যতবড় উদ্যোগই নেয়া হোক অর্থসঙ্কটে পড়তে হবে না, অর্থের অভাবে কাজ বন্ধ থাকবে না।

শেষকথা : রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি সাধারণত চারটি কারণে আমরা সহানুভূতিশীল। ওরা মুসলমান, ওরা মজলুম, আমাদের সঙ্গে ওদের সমিল চেহারা আর চট্টগ্রামবাসীর সঙ্গে ওদের সমিল ভাষা। এ-ই কারণ যে, দেখে দেখে এখন নিজেকেই শরণার্থী মনে হয়। আবেগ উথলে ওঠে। কিছু করতে মনে চায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত এ লেখার প্রেরণা। তবে পুনর্বাসন প্রশ্নে আমাদের এসব প্রস্তাবনাই চূড়ান্ত কথা নয়। কেউ কিছু করতে চাইলে চিন্তা-ভাবনার কিছু উপাদান সরবরাহ মাত্র।

লেখক : ইমাম ও খতীব, বাইতুর রহমান বড় জামে মসজিদ, বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
শিক্ষক, জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা

হায়! মায়ের সঙ্গে আমিও যদি পুড়ে যেতাম!

আহমাদ মুহিউদ্দীন

লেদা-মুছনীর দুর্গম পথ পেরিয়ে সবুজঘেরা উঁচু পাহাড়। বিষণ্ন চেহারায় তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছলছল দু'টি চোখে সকাতর চাহনী। নাফ নদের ওপারেই দেখা যাচ্ছে প্রিয় মাতৃভূমি। আব্দুল্লাহ নামের ছেলেটি অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। মাকে ফিরে পাওয়ার আশায় পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। নতুন কোন নৌকা তীরে ভিড়লেই সে ছুটে যাচ্ছে। মায়ের মত বোরকা পরা কোন মহিলাকে দেখলেই গিয়ে মা কিনা খোঁজ নিচ্ছে...।

আমাদের দায়িত্ব ছিল লেদা-মুছনীর ক্যাম্পে ত্রাণ বিতরণ করা। যিম্মাদার ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়ার শায়খে সানী হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দা.বা.। কক্সবাজার থেকে লেদা-মুছনী যাওয়ার পথে আমাদের গাড়িটা প্রথমে বালুখালী ক্যাম্পে থেমেছিল। এখানে অবস্থান নিয়েছেন মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মুমিনপুরী হুযূর দা.বা.। রাস্তার দু'পাশে দেখা যাচ্ছিল অসংখ্য ছাউনি। নির্যাতিত মানুষদের করুণ দৃশ্য। ক্ষুধার্ত, অনাথ, অসহায় শিশুরা যাকেই দেখছে পেট দেখিয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। মুখে বলে চাওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে বোধহয়। কখনো এমন লোকের কাছে হাত বাড়াচ্ছে, যে নিজেই অন্যের কাছে চাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আমাদের সামনেই মাটিতে বসা একযুবক। পুরো শরীরে ধুলোবালি। চোখে-মুখে অসহায়ত্বের ছাপ। গায়ে ছিন্ন বস্ত্র। মাথা উঁচিয়ে আশাতুর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। কিছু পাওয়ার আশায় যখন হাত বাড়াল অমনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবু সে ক্ষান্ত হল না। বুকে ভর করে কাছে এসে পা জড়িয়ে ধরল। তাকে কিছু টাকা দেয়ার সাথে সাথে অসংখ্য লোক আমাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের ভাষা ভিন্ন হলেও চাওয়া আমাদের মতই। ক্ষুধা আমাদের মতই। ক্ষুধার কষ্টও আমাদের মতই। তাই এ ভাষাগুলো বুঝতে দোভাষীর প্রয়োজন হয়নি। ড্রাইভার উসমান ভাই তাদেরকে না সামলালে আমরা বিপদে পড়ে যেতাম।

লেদা-মুছনীর উদ্দেশ্যে আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। শায়খে সানীসহ গাড়িতে ছিলেন মাওলানা জামালুদ্দীন রাহমানী ও মাওলানা মাহমুদ হাসান গুনবী সাহেব। সমবয়সী হওয়াতে গুনবী সাহেব প্রথম সাক্ষাতে সাহেব থেকে ভাই হয়ে গেছেন। গুনবী ভাই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে প্রথমদিন থেকেই সেখানে কাজ করছেন। ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। উখিয়ার ক্যাম্প দেখিয়ে বললেন, আলেমদের একটি জামাআত এই ক্যাম্পে তিন ট্রাক চাল, ডাল ও খাদ্য নিয়ে আসেন। তারা বিতরণ করার জন্য সাথে কোন বস্তা আনেননি। এই সুযোগে খ্রিস্টান এনজিও ইউনিসেফ তাদেরকে কিছু বস্তা দেয়, যেগুলোতে ইউনিসেফের নাম ছিল। ত্রাণ দিল আলেমরা আর হাজার হাজার ছবি তুলে প্রচার করল ইউনিসেফ। এই ছিল আমাদের অসচেতনতার ফল। আরেক জায়গায় আলেমগণ তিনটি বাথরুম ও একটি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করলেন। ব্র্যাকের লোকেরা এসে পাশেই একটি বাথরুম করে তাদের নামের ব্যানার লাগিয়ে দিল। সবগুলো বাথরুম ও টিউবওয়েলসহ ছবি তুলে মানুষকে দেখাল– তারাই সব করেছে। এক জায়গায় এনজিওর লোকেরা একটা টিউবওয়েল গাড়তে শুরু করল। আমরা আশান্বিত হলাম- তাদের ভিতরেও কিছু মানবতা আসতে শুরু করেছে। মানুষের পানির কষ্ট দেখে তাদেরও দয়া হয়েছে। দু'দিন বোরিং করার পর বিভিন্ন রকমের ব্যানার লাগিয়ে তারা ছবি তুলল। তৃতীয় দিন তারা টিউবওয়েলের সব সরঞ্জামাদি নিয়ে চলে গেল। যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে না তারা এভাবেই সেবার নামে প্রতারণা করে।

গুনবী ভাই আমাদেরকে প্রথমে মসজিদুল আবরারে নিয়ে গেলেন। দীনদার মুহাজিররা আমাদেরকে দেখে আশান্বিত হল। মসজিদে সমবেত হয়ে অপেক্ষায় রইল কিছু শুনতে, কিছু পেতে। নিজেদের এত অভাব-অনটনের মধ্যেও তারা আমাদেরকে পানি ও পানীয় দ্বার মেহমানদারী করল। শায়খে সানী ও মাওলানা জামালুদ্দীন রাহমানী সাহেব তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন; ধৈর্য ধরার নসীহত করলেন। ঈমানের মত অমূল্য নিয়ামতের উপর অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাদের মধ্যে অনেক আলেম ও হাফেয ছিলেন। দু'জন হাফেয আমাদেরকে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত শুনালেন– মধুর ও মর্মস্পর্শী তিলাওয়াত। আমরা সকলকে কিছু টাকা হাদিয়া করে বিদায় নিলাম।

এখন আমরা লেদা-মুছনীর যে এলাকায় এসেছি, এখানে আগে থেকেই মসজিদ ছিল। গুনবী ভাইয়েরা এসে নতুন করে মাদরাসা করেছেন। দশ/পনের দিন হল আরাকানের একমাদরাসার সকল ছাত্র এখানে এসে উঠেছে। উস্তাদ মাত্র দু'জন আর ছাত্র প্রায় তিনশত। ছাত্রাবাসের তেমন ব্যবস্থা হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার জন্য বোর্ডিংয়েরও কোন ব্যবস্থা নেই। খাবারের সময় ছেলেরা নিজেদের ছাউনিতে গিয়ে খেয়ে আসে। যাদের বাবা-মা নেই অথবা ছাউনি অনেক দূর তাদেরকে কাছের লোকেরা জায়গির রেখেছে। মুহতামিম বানানো হয়েছে মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ ভাইকে। মাদরাসা থেকে মুহাম্মাদুল্লাহ ভাইয়ের বাড়ি দশ কিলোমিটার দূর। উম্মত-দরদী অমায়িক মানুষ। আমাদের খবর পেয়ে বাসায় রান্না করা খাবার ও বাড়ির গাছের কলা নিয়ে এসেছেন। ক্যাম্পে যারা কাজ করেন তারা কেউ দুপুরের খাবার খেতে পারেন না। খাবারের কোন ব্যবস্থাও নেই। তবুও নিঃস্বার্থভাবে উলামায়ে কেরাম কাজ করে যাচ্ছেন। সেদিন শুধু আমরা খেতে পেরেছিলাম। দুপুরের খাবার খেতে বসে স্বেচ্ছাসেবী উসমান ভাই বলে ফেলেছিলেন, চৌদ্দ দিন পর আজ দুপুরে খাবার খেলাম।

আমরা এবার প্রতিটি ছাউনিতে গিয়ে সরাসরি মুহাজিরদের হাতে টাকা দেয়ার ইচ্ছা করলাম। পাহাড়ি ভূমি। প্রচণ্ড রোদ। গিরিপথে ঝরনার আবদ্ধ পানি। পাহাড়ের ঢালুতে মুহাজির ভাইদের ছাউনি। কী করুণ দৃশ্য। পলিথিন আর গাছের ডাল দিয়ে আলোকে আঁধার করার চেষ্টা। রোদের তাপে যা বাধা হবে না। বৃষ্টির ফোঁটায় যা আড়াল হবে না। আপনি দেখলে বলবেন, এ-তো চোখের আড়াল হওয়ার কৃত্রিম প্রচেষ্টা মাত্র। একটি ছাউনিতে গিয়ে গুনবী ভাই জিজ্ঞেস করলেন, বেডা (স্বামী) কই? গুনবী ভাই তাদের ভাষা বোঝেন এবং তাদের ভাষায় কথাও বলতে পারেন। গত সপ্তাহে তিনি তাদের ভাষায় জুমু'আর বয়ানও করেছিলেন। ছাউনির ভেতর থেকে লজ্জাবনত, শোকাহত কণ্ঠে এক মা সাড়া দিলেন, জ্বলি গেছুই (আগুনে পুড়ে মারা গেছে)। ভেতরে দেখা গেল চার/পাঁচটি শিশু। অসহায়

এই মা শিশুদেরকে নিয়ে জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকলেও আল্লাহ ছাড়া আশ্রয়ের আর কেউ নেই। সামনে অগ্রসর হলাম।
পাহাড়ের আড়ালে গাছের পাতার উপর শুয়ে আছে ফুটফুটে একটি শিশু। মাথার উপর ঝুলছে এক টুকরো পলিথিন। রোদের তাপদাহ থেকে বাঁচাতে মায়ের এই প্রচেষ্টা। তারপরও ফাঁকি দিয়ে রোদ ভেতরে চলে এসেছে। ব্যর্থ মা কাপড়ের আঁচল দিয়ে সন্তানকে বাতাস করছেন। হায়! এখানে যদি সূর্যই না উঠত, কিংবা ওর উপর থেকে রোদটা যদি সরিয়ে দেয়া যেত!
মুহাজির মা ও বোনেরা অত্যন্ত পর্দানশীন। আমরা তাদেরকে টাকা দিচ্ছিলাম। তারা পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করেই আমাদের থেকে তা গ্রহণ করছিলেন। কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারকেও দেখা গেল। পরিস্থিতির কারণে তারাও আজ অন্যের দিকে চেয়ে আছে। এ পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়ার পথে দৌড়ে এসে একলোক বলল, হুযূর! এই বাচ্চাগুলোর মা-বাবা কেউ নেই– এদেরকেও কিছু দিন। আমরা তাদেরকে শুধু টাকাই দিতে পেরেছিলাম; মা-বাবা কিংবা মা-বাবার আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা কিছুই দিতে পারিনি।
মা-বাবা হারা এমনই এক বালক আব্দুল্লাহ। অন্যদের মত সে টাকা নিতে আসেনি। দূর পাহাড়ের চূড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি নাফ দরিয়ায় হলেও ভেতরের দৃষ্টি আরো দূরে, বহুদূরে। তাদের এলাকার চেয়ারম্যানের নাম ছিল উসমান। একদিন আর্মিরা এসে চেয়ারম্যান সাহেবকে বলল, তোদের এলাকায় গুপ্তচর কে কে, বের করে দে। চেয়ারম্যান বললেন, আমার জানা নেই। আর্মিরা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন যুবক ও মধ্যবয়সী লোককে ধরে আনল। যুবকদেরকে সবার সামনেই গুলি করে মেরে ফেলল। মধ্যবয়সীদেরকে ধরে নিয়ে গেল– বলল, জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিব। এদের মধ্যেই ছিল আব্দুল্লাহর বাবা ও বড় ভাই। আব্দুল্লাহ ও তার মা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল, কিছুই করতে পারল না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান সাহেব সকলকে বলে দিলেন, এখানে আমাদের কোন নিরাপত্তা নেই, ওরা যে কোন সময় আমাদেরকেও মেরে ফেলতে পারে। আমি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছি, যারা আমার সঙ্গে যাবে প্রস্তুত হও। আব্দুল্লাহর মায়ের বুকে আশা-নিরাশার দোলাচল। স্বামী ও বড় ছেলেকে পাওয়ার আশা কোনভাবেই তিনি ছাড়তে পারলেন না। আব্দুল্লাহকে বললেন, বাবা তুমি চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে চলে যাও। তোমার বাবা ও ভাই ফিরে এলে তাদেরকে নিয়েই আমি আসছি।
প্রাণ বাঁচাতে আব্দুল্লাহ যখন সকলের সাথে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল মায়ের চোখ তখন অশ্রুতে টলমল করছিল। মুখে বলছিলেন, যাও বাবা; আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আব্দুল্লাহর ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে কান্নার জোয়ার এসেছিল; কিন্তু তখন কান্নার সময় ছিল না। সবাই নৌকায় উঠে পড়েছে। মা টিলায় উঠে আব্দুল্লাহকে দেখছিলেন। আব্দুল্লাহও পেছনে ফিরে ফিরে মাকে দেখছিল। যতবার পেছনে তাকিয়েছে একবারও মাকে অন্য দিকে তাকাতে দেখেনি। মা কখনো হাত নাড়ছিলেন, কখনো আঁচলে চোখ মুছছিলেন।
নৌকা তখন নাফ নদীর মাঝামাঝি। আব্দুল্লাহ পেছন ফিরে দেখল, তাদের গ্রামে আগুন জ্বলছে। এতো অল্প সময়ে তার মা কি ওখান থেকে বের হতে পেরেছে! এখন আব্দুল্লাহর প্রতিদিনের কাজ- পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মায়ের প্রতীক্ষায় একদৃষ্টিতে নাফ দরিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা। এই বুঝি বাবা ও ভাইকে নিয়ে মা এল! কখনও ভাবে, হায়! বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে আর্মিরা আমাকেও কেন নিয়ে গেল না। আমি কেন মাকে ছাড়া একা একা চলে এলাম। কিংবা হায়! মায়ের সঙ্গে আমিও যদি পুড়ে যেতাম! মায়ের সঙ্গে মরেও শান্তি পেতাম!!

লেখক : নায়েবে মুহতামিম, জামি'আতুল আবরার দাওয়াতুস সুন্নাহ, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

‘সন্ত্রাসবাদ’ পশ্চিমা বিশ্বের অভিধানে

তানভীর মুস্তফা

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে যে শব্দটি দিয়ে সবচে’ বেশি ঘায়েল করা হচ্ছে এবং ইসলামের স্বচ্ছ ও সুন্দর আকৃতিকে বিকৃত করা হচ্ছে তা হলো সন্ত্রাসবাদ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের দুশমনরা নবীজীকে পাগল, কবি, যাদুকর আর মুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণের দরুণ ধর্মত্যাগী, পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করতো। তারপর যামানা আগে বেড়েছে, পৃথিবী পাল্টে গেছে, সবকিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তাই ইসলামের দুশমনরাও অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ইসলামের চেহারাকে বিকৃত করার জন্য একটি শব্দ বেছে নিয়েছে– তা হল, টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ। ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাদের দোসররা ইসলাম ধর্মকে একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা-কোশেশ করে যাচ্ছে। কিন্তু যারা বিবেকবান, বিবেককে কাজে লাগিয়ে যারা প্রতিটি বিষয়ের গভীরতায় পৌঁছার চেষ্টা করে, চাই তারা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, তাদের কাছে এ বিষয়টি সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ হলো ইসলামের উপর আধুনিক যুগের একটি অপবাদ, শুধুই অপবাদ; বাস্তবতার সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হল, যারা আমাদের উপর হরদম এই অপবাদ আরোপ করে আসছে, যখন হুবহু এ কাজটি তারাও করে তখন তা আর সন্ত্রাসবাদ হয় না। তাদের অভিধান একে সন্ত্রাসবাদ বলে না।

এই যে দেখুন, গত ৮ই অক্টোবর রোববার রাতে আমেরিকার জনবহুল শহর লাসভেগাসের এক মিউজিক ফ্যাসটিভালে পুরোপুরি সিনেমার স্টাইলে এলোপাতাড়ি ফায়ারিং করে স্টিফেন প্যাডিক নামের এক আমেরিকান বন্দুকধারী। ঘটনাস্থলেই আটান্ন জন নিহত হয়, পাঁচশরও অধিক মারাত্মক পর্যায়ের আহত হয়। এদিকে আক্রমণকারী স্টিফেন প্যাডিক আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যা করে। এ লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত মার্কিন পুলিশ এ ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্ঘাটন করতে পারেনি। তদন্তের সময় পুলিশ মেনডেলা-বে নামের হোটেল যেখানে এ আক্রমণ হয়, সেখান থেকে স্টিফেন প্যাডিকের লাশের সাথে দুই ডজন রাইফেল, ভারী গান ও বহু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। যাই হোক, নিঃসন্দেহে এ ঘটনা আমেরিকার জন্য স্মরণকালের একটি বড় ট্রাজেডি, যার জন্য আমরাও আন্তরিকভাবে মর্মাহত, শোকাহত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মার্কিন জনগণের মাঝে ব্যাপক ত্রাস ও শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চিন্তার ব্যাপার হলো, এত কিছু ঘটে গেল, মার্কিন সরকার ও তার মিডিয়া লাসভেগাসের এই আক্রমণকে আর যাই বলুক সন্ত্রাসী আক্রমণ বলে আখ্যায়িত করেনি। এর একমাত্র কারণ এছাড়া আর কিছু নয় যে, অপরাধী সাদা চামড়ার অধিকারী একজন মার্কিন নাগরিক ছিলো। তাই শত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরও সন্ত্রাসবাদ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

ঘটনার বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। মার্কিন মিডিয়া বরাবরই প্রচার করে আসছে যে, স্টিফেন প্যাডিক নামের অপরাধী সম্পূর্ণই এককভাবে এ আত্মঘাতী আক্রমণ পরিচালনা করেছে; সন্ত্রাসবাদী কোন গ্রুপের সাথে এর যোগসাজশ নেই এবং সে সেখানকার শহুরে নয়। এর দ্বারা আমেরিকার উদ্দেশ্য বিশ্ব দরবারে একথা প্রমাণিত করা যে, এ ধরনের আতঙ্কবাদী কর্মকাণ্ড বহিরাগত লোকেরাই করে থাকে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র সারা সেন্ডার্স এ ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, লাসভেগাসের এ আক্রমণকে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা দেয়া সময়পূর্ব সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ রাজনৈতিক সকল নেতৃবর্গ প্যাডিককে বিকারগ্রস্ত, উন্মাদ, মানসিক রোগাক্রান্ত ইত্যাদি বহু বিশেষণে বিশেষায়িত করলেও সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী শব্দটি তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেনি। আশ্চর্য হয়, আটান্নজন নিরপরাধ মানুষের এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেয়ার মত সৎ সাহস এ পর্যন্ত কেউ প্রদর্শন করেনি। অথচ গেলো বছরের জুনে ফ্লোরিডার এক নাইট ক্লাবে হুবহু এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনায়ও একব্যক্তি সম্পূর্ণ এককভাবে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে ৪৯জন লোকের প্রাণহানি ঘটায়। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কোন ধরনের সময় ক্ষেপণ না করেই এ ঘটনাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ বলে আখ্যায়িত করেন। যার একমাত্র কারণ, সে ঘটনায় বন্দুকধারী অপরাধী উমার মাতীন নামের একজন মুসলিম ছিল। তো লাসভেগাসের এ ঘটনা বিশ্ব দরবারে একথাই প্রমাণ করে দিলো যে, পশ্চিমা বিশ্বের অভিধানে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী শব্দ একমাত্র মুসলমানদের জন্যই নির্ধারিত; সাদা চামড়ার কোন মার্কিন নাগরিক বা তাদের দোসর অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারীদের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়।

যাই হোক, লাসভেগাসের এই ঘটনার পর যখন জনমনে জীবন বিনাশকারী এসব অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার– যে কারণে প্যাডিকের জন্য এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটানো সহজ হয়েছে তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন অত্যন্ত সুকৌশলে জনসাধারণের এ আওয়াজকে দাবিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। মার্কিন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, হৃদয় বিদারক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দানকে গরম করা আদৌ শোভনীয়

নয়। এখন হলো শোক পালনের সময়, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে পরিস্থিতিকে অশান্ত করার নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো এ ব্যাপারে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খুবই হৃদয়কাড়া ভাষণ দেন। তিনি তার ভাষণে বলেন, এই উগ্রপন্থা চাপিয়ে দিয়ে আমাদের একতাকে বিনষ্ট করা যাবে না। যদিও আমাদের স্বদেশী ভাই-বোনদের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত, মর্মাহত। তারপরও আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি, যা অতীতে আমাদের জাতীয় পরিচয় ছিলো, তা সর্বদা অটুট থাকবে। অন্তরের গভীরে রেখাপাত করার মত একেকটা বাক্য। যদিও পূর্ণ বিশ্বাস করা মুশকিল যে, এটা ট্রাম্পেরই দেয়া ভাষণ। তিনি তো সেই ট্রাম্প, যিনি লন্ডন, প্যারিস কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদের কোন ঘটনা কর্ণগোচর হতেই সামান্য কালবিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় তাকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ঘায়েল করার মত এমন সুযোগকে তিনি কখনোই হাতছাড়া হতে দেন না। এই যে কিছুদিন পূর্বে লন্ডন ব্রীজে আক্রমণ হল –যা নিয়ে ট্রাম্প খুবই আতঙ্কগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন– এক বেনামী সংস্থার টুইটবার্তার উপর ভিত্তি করে সে ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা ২০জন বলে দাবী করেন। অথচ পূর্ণ তদন্তের পর যে তথ্য সামনে আসে এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সে ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীদের সংখা সর্বসাকুল্যে সাতজন ছিলো। পরবর্তীতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রাম্প আমেরিকায় মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জোর চেষ্টা চালান এবং লন্ডনের মুসলিম মেয়র সাদেক খানের প্রতি সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করেন।

যাই হোক, এরপরও সুখ-সংবাদ এই যে, আন্তর্জাতিক কিছু মিডিয়া লাসভেগাসের এই হত্যাকাণ্ডের পর প্রশ্ন তুলেছে যে, একই ধরনের ঘটনায় খ্রিস্টান-মুসলিমের পার্থক্য করা হচ্ছে কেন?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত সাংবাদিক 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর বিশিষ্ট কলাম লেখক থমাস ফ্রেডমিন আলোচিত ঘটনার উপর বিশ্লেষণ করেন। তিনি এর শিরোনাম দেন, If onli stephen paddock were a muslim, খ্যাতিমান এই সাংবাদিকের শিরোনাম থেকেই এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বরাবরই মার্কিন সরকারের দৃষ্টিতে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীগোষ্ঠী নির্দিষ্ট একটি ধর্মের অনুসারীরা হয়ে থাকে।

ফ্রেডমিন লেখেন, যদি লাসভেগাসের এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি মুসলিম হত, যদি সে মিউজিক কনসার্টে অংশগ্রহণকারী দর্শকদের উপর গুলিবর্ষণের সময় আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করত, তাহলে কেউ আমাদেরকে এ উপদেশ দিত না যে, এ শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ময়দানে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। বরং ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তো বিশ্লেষক ফ্রেডমিনের বর্ণনা অনুযায়ী যদি আজ লাস ভেগাসের এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের অপরাধী কোন মুসলিম দেশের নাগরিক হতো, তাহলে হয়তো এতক্ষণে মার্কিন সরকার সে দেশের ইট থেকে ইট আলাদা করে ফেলতো। কিন্তু অপরাধী খোদ মার্কিন নাগরিক বলে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সকল নেতৃবর্গ এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার যত ব্যবস্থা হতে পারে, সব গ্রহণ করেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিগত দুই দশকে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন এবং সিরিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। নাইন ইলেভেনের সেই ভয়াবহ আক্রমণ বাস্তবেই নিন্দার যোগ্য, আমরাও এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। কিন্তু কথা হলো, সে হামলায় তিন হাজারের কাছাকাছি আমেরিকান নাগরিক নিহত হয়েছে। অথচ এর জের ধরে গত দুই দশকে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর হাতে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মুসলমানের রক্ত ঝরেছে, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। বিশ্ববিবেক এ কর্মকাণ্ডকে কোন শব্দে ব্যক্ত করবে, তা আমরা জানতে চাই।

চলমান সময়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের দিকে একটু তাকান। সেখানকার চরমপন্থী বৌদ্ধ সরকার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন এখানে বোধ করছি না। সেখানকার আকাশ-বাতাস আজ মযলুম মুসলমানের গগণবিদারী আর্ত-চিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে। যুলুম ও নির্যাতনে মায়ানমারের বৌদ্ধরা তাতারীদেরকেও হার মানিয়েছে। যাদের ধর্মের মূল বাণী 'প্রাণী হত্যা মহাপাপ', তাদের কাছে আজ মুসলমান নামের প্রাণী হত্যায় কোন পাপ নেই। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচির সরকারের তরফ থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আজ বিশ্ববিবেক নীরব, নির্বিকার। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা মযলুম রোহিঙ্গা মুসলমানদের পক্ষে মুখটা পর্যন্তও খুলছে না। কারণ, তাদের অভিধানে একে সন্ত্রাস বলে না। কিন্তু যদি আজ চিত্র এর উল্টো হতো, যা আমরা দেখছি, তাহলে দেখা যেতো আমেরিকা ও তার দোসরদের উগ্রনিনাদ ও নগ্ন অস্ত্রবাজি।

আশ্চর্য হয় আমার সে সকল ভাইদের বিবেকের উপর, ইসলাম যাদের চোখের কাঁটা, আমরা মযলুম, আমরা নির্যাতিত, তারপরও আমরা জঙ্গিবাদী। আমরা নিপীড়িত, আমরা নিগৃহিত, তারপরও আমরা সন্ত্রাসবাদী। আমরা বিতাড়িত, আমরা বাস্তুচ্যুত, তারপরও আমরা আতঙ্কবাদী। এ কেমন বিচার! এ কেমন ইনসাফ!

লেখক : ফাযেল, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

ডাক্তারদের জন্য ডায়গনস্টিক সেন্টার ও ঔষধ কোম্পানী প্রদত্ত

পার্সেন্টিজ ও উপঢৌকন গ্রহণের শরয়ী বিধান

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের বিধি-নিষেধ ইসলামে বিবৃত হয়েছে নীতিগত এবং কার্যত উভয় পদ্ধতিতে। অর্থনৈতিক সমস্যার পরিমণ্ডলে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যা নিরসনে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামে রয়েছে প্রান্তিকতামুক্ত ভারসাম্যহীন অর্থব্যবস্থা। যেখানে যথেচ্ছা ব্যয়ের যেমন সুযোগ নেই, তেমনি যেমন খুশি তেমন আয়েরও কোনো অবকাশ নেই। এখানে ব্যক্তি উদ্যোগকে যেমন স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি হালাল-হারামের বিধি-নিষেধের মাধ্যমে তার বল্গাহীনতাকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যে সকল কারণে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে, তার অন্যতম একটি কারণ হলো 'কমিশন' ব্যবস্থা। ধনতন্ত্রের লাগামহীনতাকে পুঁজি করে সৃষ্টি হওয়া এ 'কমিশন' ব্যবস্থায়ও রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

বর্তমানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেবাদানকারী মানবতার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তারগণের মাঝে এখন এই কমিশন ব্যবস্থা 'অতি লাভজনক বাণিজ্যে'র রূপ লাভ করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'খেদমত' এবং সেবার নিমিত্তে ইসলামে অশেষ সওয়াবের কথা বিবৃত হয়েছে। এমনকি অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যাওয়া 'হক' তথা অপর মুসলমানের কর্তব্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং শুশ্রূষায় গমনকারীর জন্য এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ সে অসুস্থ ভাইয়ের সেবায় থাকবে, সে জান্নাতে বিচরণ করতে থাকবে...!

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, অনেকের ক্ষেত্রে এই অশেষ সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমটি বর্তমানে বস্তুবাদী মানসিকতার প্রভাবে সম্পদ অর্জনের বাণিজ্যিক উপায় পরিগ্রহ করেছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারী ডাক্তারদের একটি শ্রেণী আজ এ বাণিজ্যের শিকার। একথা বলাই বাহুল্য যে, সম্মানজনক ব্যতিক্রম তো অবশ্যই আছে এবং নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামাজিক স্রোতের বিরোধিতায় সাহসী নন- এমনও অনেকেই আছেন, এতদসত্ত্বেও ইসলামের নির্দেশনা সামগ্রিকতার বিচারে, যেন কেউ শোষক আর কেউ শাসিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়।

চিকিৎসা সেবাদান খাতে ডাক্তারদের কমিশন গ্রহণের যে প্রচলনগুলো সমাজে রয়েছে, আমাদের জানামতে তা নিম্নরূপ-

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা থেরাপী গ্রহণের জন্য ডাক্তার কর্তৃক রোগীকে নির্ধারিত কোনো ডায়গনস্টিক সেন্টার, থেরাপী সেন্টার কিংবা প্যাথলজী বা ল্যাবে পাঠানো এবং প্রত্যেক রোগী বাবদ পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন গ্রহণ।

রোগীকে নির্দিষ্ট কোনো দোকান থেকে ঔষধ কেনার বা চোখের সমস্যার জন্য চশমা কেনার পরামর্শ দিয়ে ঔষধের দোকান বা চশমার দোকান থেকে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী কমিশন গ্রহণ।

প্রেসক্রিপশনে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানীর ঔষধ লিখে উক্ত কোম্পানী হতে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি মতে কমিশন গ্রহণ।

অপারেশন কিংবা দীর্ঘমেয়াদী বা জটিল কোনো রোগের চিকিৎসার নিমিত্তে নির্দিষ্ট কোনো হাসপাতালে রোগীকে ভর্তির পরামর্শ দিয়ে উক্ত হাসপাতালের বেডচার্জ হতে বা অন্য কোনো খাত থেকে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী কমিশন গ্রহণ।

এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগী স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হাসপাতাল হতে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী কমিশন গ্রহণ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কমিশনের উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো বৈধ কি না, এ আলোচনার আগে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা জরুরী মনে করছি।

১. রোগীর কাছ থেকে একজন ডাক্তার যখন চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের নিমিত্তে টাকা নিয়ে নেয়, তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক হলো 'আজীর' (শ্রমদাতা বা শ্রমিক) এবং 'মুস্তাজির' (শ্রমগ্রহিতা) -এর সম্পর্ক। এখানে রোগী হলো 'মুস্তাজির' এবং 'ডাক্তার' তলো 'আজীর'। 'উযরত' (পারিশ্রমিক) বাবদ ভিজিট নেয়ার কারণে চিকিৎসার স্বার্থে রোগীকে নিম্নোক্ত সব ধরনের পরামর্শ দেয়া ডাক্তারের পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব হয়ে যায়-

(ক) রোগীর রোগ অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজন হলে মানসম্মত কোনো ডায়গনস্টিক সেন্টার, থেরাপী সেন্টার, প্যাথলজী বা ল্যাব-এর পরামর্শ দেয়া।

(খ) গুণগত মানসম্মত কোনো ভালো কোম্পানীর ঔষধের পরামর্শ দেয়া।

(গ) ভালো ডিসপেন্সারী থেকে ঔষধ ক্রয়ের পরামর্শ দেয়া।

(ঘ) প্রয়োজনে মানসম্মত কোনো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেয়া।

২. 'ইজারা' বা ভাড়া চুক্তি বলতে বোঝায় কোনো বস্তু বা ব্যক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে সুনির্দিষ্ট উপকার লাভ করা। স্বতন্ত্রভাবে ইজারাচুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ, যদি তাতে অন্য কোনো হারাম যেমন ঘুষ ইত্যাদির সংমিশ্রণ না ঘটে।

৩. 'সিমসার' বা দাল্লাল (মিডিয়া কর্মী) বলতে বোঝায় নির্ধারিত কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি যেমন ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে মধ্যস্থতার শর্তে একপক্ষ কিংবা দু'পক্ষের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে। (আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাত আল-কুয়াইতিয়্যাহ ১০/১৫১)

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মধ্যস্থতার বিনিময় বৈধ আছে, যদি তাতে অন্য কোনো হারামের যেমন ধোঁকা,

প্রতারণা বা ঘুষ ইত্যাদির সংমিশ্রণ না ঘটে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৪৭, ৬৩)

৪. ঘুষ বা উৎকোচ বলা হয় নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত কমিশন নেয়া।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী থানবী রহ. বলেন (কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন; ২/২৭৩), 'ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে মালের আদান-প্রদানকে ঘুষ বা উৎকোচ বলা হয়ে থাকে'।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আবূ বকর জাস্‌সাস রহ. বলেন (আহকামুল কুরআন ২/৬০৭), নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে যে কাযী সাহেব হাদিয়া গ্রহণ করবে, সে ঘুষ গ্রহণের দোষে ফাসেক এবং মারাত্মক গুণাহগার সাব্যস্ত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে যদি ডাক্তারগণের কমিশন গ্রহণের উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলোতে চিন্তা করা হয়, তবে এ চুক্তিসমূহকে ইজারা সাব্যস্ত করে কমিশনকে উযরত বা পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করা যেমন সম্ভবপর মনে হয় না, তেমনি এ চুক্তিকে 'দালালী' নির্ধারণ করে কমিশনকে দালালী বা মধ্যস্থতার কমিশন নাম দেয়াও বৈধ মনে হয় না।

কেননা, ইজারা বা ভাড়াচুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো-

যে কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া নেয়া হচ্ছে, উক্ত কাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর পূর্ব হতেই আবশ্যক না হতে হবে, অন্যথায় ইজারাচুক্তি বৈধ হবে না। (ওয়াহবা যুহাইলী রহ. কৃত আল-মু'আমালাতুল মালিয়্যাহ আল-মুআসারাহ; পৃষ্ঠা ৭৩)

আর একথা সুস্পষ্ট যে, ডাক্তার সাহেব যখন রোগী থেকে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান বাবদ ভিজিট নিয়েছেন, তখন চিকিৎসা বাবদ (উপরোল্লিখত) সকল পরামর্শ প্রদান করা ডাক্তারের দায়িত্ব এবং আশ্যকীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই এ দায়িত্ব ও আবশ্যকীয় কর্তব্য আদায়ের নিমিত্তে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশনের নিমিত্তে ইজারা চুক্তি বৈধ হবে না।

দাল্লাল বা সিমসার (মিডিয়া কর্মী) হিসেবেও মধ্যস্থতার বিনিময় ধারণ করে উপরোক্ত কমিশন গ্রহণও বৈধ হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে বিষয়টি কেবল মধ্যস্থতার বিনিময় থাকছে না; বরং নিজ আবশ্যকীয় দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে বিনিময় নেয়া হচ্ছে, ফলে তা উৎকোচে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কেননা, আমরা উল্লেখ করেছি যে, ভিজিট নেয়ার পর রোগীকে চিকিৎসার স্বার্থে সব ধরনের পরামর্শ প্রদান করা একজন ডাক্তারের নৈতিক এবং পেশাগত দায়িত্ব।

তাছাড়া একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ডাক্তারগণ যে কমিশন ডায়গনস্টিক সেন্টার থেকে নিয়ে থাকেন, তা মূলত ভোক্তাদেরই টাকা। ফল হচ্ছে যে, টেস্ট ইত্যাদির পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার রোগী থেকে দু'বার টাকা নিচ্ছে– একবার ভিজিট হিসেবে রোগীর ইচ্ছায় জ্ঞাতসারে, দ্বিতীয়বার ডায়গনস্টিক সেন্টারের মধ্যস্থতায় রোগীর অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে। কাজেই তা কখনোই বৈধ কমিশনের পর্যায়ে পড়ে না; বরং সংশ্লিষ্ট ঔষধ কোম্পানী, ঔষধ বিক্রেতা, ল্যাব, ডায়গনস্টিক/ থেরাপী সেন্টার, হাসপাতাল থেকে কমিশনের নামে ডাক্তারগণ যে টাকা গ্রহণ করছেন নিঃসন্দেহে তা ঘুষ এবং উৎকোচ। কেননা, ডাক্তার তার দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে বাড়তি টাকা গ্রহণ করছে, শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই ঘুষ বা উৎকোচ বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং ইজারা বা মিডিয়া কর্মী- কোনো যুক্তিতেই বিভিন্ন ধরনের টেস্ট ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক্তারগণের কমিশন গ্রহণ জায়েয হবে না; বরং তা অনৈতিক, অযৌক্তিক ও উৎকোচ হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয হবে।

উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত শরঈ দৃষ্টিকোণ ছাড়াও এ ধরনের অনৈতিক উৎকোচ মানবতার দাবীতেও সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেননা, এর কারণে একদিকে যেমন অসহায় রোগীরা লুটপাটের শিকার হচ্ছে, তেমনি অসাধু টেস্টকারী প্রতিষ্ঠান এবং গুণগতমানহীন ঔষধ কোম্পানী তৈরি হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে, অপরদিকে দেশের মানুষ শারীরিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কাজেই সার্বিকভাবেই এ কমিশন বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

ঔষধ কোম্পানীর পক্ষ হতে ডাক্তারদের দেয়া বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন

বর্তমানে এ বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, ঔষধ কোম্পানীর পক্ষ হতে ডাক্তারদের বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয়ে থাকে। প্যাড-কলম থেকে শুরু করে দামী দামী ঘরোয়া সামগ্রী এবং ভ্রমণ ও ভ্রমণের টিকিট এ উপহারের অন্তর্ভুক্ত। উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এগুলোকে হাদিয়া বলা হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো হাদিয়া নয়; বরং তা ঘুষের নামান্তর।

ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলা পরিস্কার উল্লেখ করেছেন যে, কাযী সাহেব তথা শরীয়াহ মতে মুসলমানদের বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিযুক্ত বিচারক ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব গ্রহণের পর অসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির উপঢৌকন গ্রহণ কর বৈধ নয়; কেননা, তা ঘুষের নামান্তর। তেমনি পূর্বে পরিচিত কেউ যদি স্বাভাবিক অভ্যাসের তুলনায় বেশি উপঢৌকন প্রদান করে কিংবা কোনো নিকটাত্মীয় যদি আদালতে তার কোনো মামলা থাকা অবস্থায় হাদিয়া বলে কিছু দেয়, তবে তা গ্রহণ করা কাযী সাহেবের জন্য বৈধ হবে না। কেননা, হাদিয়া বলে দেয়া হলেও মূলত তা হাদিয়া নয়; বরং ঘুষ। (বাদায়িউস সানায়ে' ৯/১২০)

ফুকাহায়ে কেরাম একই হুকুম মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে উল্লেখ করেছেন। (ফাতাওয়া শামী ৫/৩৭৩)

অর্থাৎ সঠিকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা কাযী সাহেবের আবশ্যকীয় দায়িত্ব। তেমনি জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তির জন্য তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। কাজেই এ দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে কোনো ধরনের হাদিয়া গ্রহণ করা নাজায়েয উৎকোচের শামিল হবে।

একই হুকুম প্রযোজ্য হবে বর্তমানের ডাক্তারদের ক্ষেত্রে। যেহেতু রোগী থেকে ভিজিট নেয়ার পর একজন ডাক্তারের দায়িত্ব হয়ে গেছে রোগীকে চিকিৎসা সম্পর্কিত যাবতীয় জরুরী পরামর্শ আমানতদারীর সাথে প্রদান করা। কাজেই যে কোনো ভালো কোম্পানীর ঔষধের পরামর্শ দেয়াও তার দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সে দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে কোনো ধরনের হাদিয়া গ্রহণের সুযোগ নেই।

বাস্তবতার নিরিখে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঔষধ কোম্পানীর পক্ষ হতে ডাক্তারদেরকে যে হাদিয়া প্রদান করা হয়, তা কেবল এ জন্যই দেয়া হয় যে, ডাক্তার সাহেব যেন অন্য ঔষধ কোম্পানীর পরিবর্তে হাদিয়া প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীকে সেবন করতে বলেন। এ উদ্দেশ্যের কথা

রিপ্রেজেন্টিটিভগণ যদিও বলেন না, কিন্তু বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে, যদি কোনো ডাক্তার ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি রিপ্রেজেন্টিটিভকে একথা বলে দেয় যে, 'আপনার এ উপঢৌকনের কারণে বাড়তি কোনো সুবিধা আমি আপনার কোম্পানীতে দিতে সক্ষম নই'! কেননা , দু-চার দিন ডাক্তার সাহেবের মন ভেজানোর চেষ্টা করলেও বাস্তবতা হলো কিছুদিন পর থেকে ঐ রিপ্রেজেন্টিটিভ এ ডাক্তারকে আর কোনো হাদিয়া দিতে উৎসাহী হবে না...! কাজেই হাদিয়া বললেও মূলত তা উৎকোচ।

এখানে এ যুক্তি পেশ করা যেতে পারে যে, , হাদিয়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঔষধ গুণগতমানের দিক দিয়ে ভালো হলে কেন হাদিয়া গ্রহণ অন্যায় হবে?' কিন্তু এ যুক্তি একেবারেই অবান্তর! কেননা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মানসম্মত না হলে তো ডাক্তার সাহেব ঘুষ গ্রহণের পাশাপাশি 'খেয়ানত' এবং ধোঁকাবাজীর দোষে দুষ্ট হবেন, আর মানসম্মত হলেও তিনি ঘুষ গ্রহণের দোষ থেকে বাঁচাতে পারবেন না।

সারকথা হলো, ডাক্তারদের জন্য কোম্পানীর পক্ষ হতে ব্যক্তিগত কাজে উপকারে আসে এমন কোনো ধরনের হাদিয়া যেমন প্যাড, কলম, ঘরোয়া ফার্নিচার ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ নয়। ঔষধ কোম্পানীগুলো যদি তাদের পণ্যের গুণগত মান উন্নততর করতে পারে, তবে আশা করা যায়, ডাক্তাররা তাদের কোম্পানীর ঔষধ এমনিতেই রোগীকে সেবনের পরামর্শ দিবেন। ডাক্তারগণও যদি আমনতদারীর সাথে ভালো কোম্পানীর ঔষধই দেন, তবে কোনো কোম্পানী মানহীন ঔষধ প্রস্তুতের দুঃসাহস করবে না এবং ডাক্তারদের প্রতি আস্থা তৈরি হওয়ায় রোগীরও ঘাটতি হবে না।

উল্লেখ্য, ঔষধ কোম্পনী কর্তৃক ডাক্তারদের সাথে হাদিয়া আদান-প্রদান নাজায়েয হলেও কোম্পানী যদি চায়, তবে নতুন ঔষধ বাজারজাত করণের স্বার্থে বৈধ উপায়ে প্রচারণা চালাতে পারে। যেমন ঔষধের গুণগতমান কিংবা মাননির্ণয়কারী সংস্থার সত্যায়ন সম্বলিত লিফলেট, ক্যালেন্ডার, নোটবুক, ডায়েরী ইত্যাদি ডাক্তারদের/ফার্মাসিস্টদেরকে ঔষধের মান সম্পর্কে অবগতির স্বার্থে কিংবা প্রচারণার নিমিত্তে দেয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, (ক) বর্তমানে ডাক্তারদেরকে কমিশন দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রোগীদের কাছ থেকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ অতিরিক্ত চার্জ নিয়ে থাকে। এ অবস্থায় কোন সৎ ডাক্তার যদি শুধু কমিশন গ্রহণ থেকে বিরত থাকে তাহলে সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ শতাংশ অতিরিক্ত চার্জ প্রতিষ্ঠানের ফান্ডেই জমা থাকবে, রোগীর কোন উপকারে আসবে না। কাজেই সত্যাশ্রয়ী ডাক্তারের জন্য জরুরী দায়িত্ব হলো, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেস্ট লেখার সাথে সাথে চল্লিশ বা পঞ্চাশ শতাংশ ডিসকাউন্টের কথাটিও লিখে দেয়া এবং যে প্রতিষ্ঠান তার এ সুপারিশ রক্ষা করবে সে প্রতিষ্ঠানেই রোগীকে রেফার করা।

(খ) ব্যবহারযোগ্য উপহার সামগ্রী বা স্যাম্পল যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনো নিতে হয় তাহলে তা নিয়ে কোন গরীব-দুঃখীদেরকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে। হ্যাঁ, ঔষধের গুণাগুণ সম্বলিত প্রচার পণ্য এমনভাবে ব্যবহার বা হাদিয়া করতে পারবে, যার দ্বারা প্রচারের কাজটি ভালোভাবে অর্জিত হয়।

(গ) মাসআলা না জানার কারণে কেউ ইতোপূর্বে কমিশন ও উপঢৌকনের নামে উৎকোচ গ্রহণ করে থাকলে তা প্রতিবিধানের পন্থা হলো, গ্রহণকৃত কমিশন ও উপঢৌকনের সমপরিমাণ বস্তু বা সমপরিমাণ মূল্য সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের মধ্যে সদকা করে দিতে হবে। একসঙ্গে সম্ভব না হলে সামর্থ্য অনুপাতে ধীরে ধীরে হলেও এ হারাম আয়ের দায় থেকে মুক্ত হতে হবে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, চিকিৎসাসেবার মত এমন একটি মহৎ এবং অশেষ সওয়াবের আমলটি যেন সামান্য বস্তুবাদী মানসিকতা এবং সামান্য অসচেতনার কারণে ঘুষ গ্রহণের দায়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে যায় এবং একজন মানুষ হিসেবে মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষার বিপরীত কোনো কাজ আমাদের দ্বারা প্রকাশ না পায়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

উদ্ধৃতি : সূরা মায়িদা- ৪২, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৯৭, আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস ২/৬০৭, বাদায়িউস সানায়ে' ৯/১২০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১১/৭৯, ফাতাওয়া শামী ৬/৪৭, ৬৩, ৮/৫৬-৫৮, কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন লিত-থানবী ২/২৭০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৪১০, আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুয়াইতিয়্যাহ ১০/১৫১)

লেখক : শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(২৫ পৃষ্ঠার পর; নবুওয়াতী সূর্যোদয়)

গাছ-গাছালি ও পাহাড়-পর্বত কর্তৃক সালাম প্রদান...!

কুদরতের এ সকল আয়োজনে পরম আগ্রহে কুদরতও যেন প্রহর গুণছিলো, কখন আগমন ঘটবে শেষ নবীর! মানবতার প্রাণহীন দেহে আবার কখন আসবে প্রাণের স্পন্দন! মানবতার এ বসন্তের আগমনানন্দে যেন উদ্বেলিত ছিলো গাছ-গাছালি, পাহাড় ও প্রকৃতি...! সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, নবীজী বলেন,

إِنِي لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إِنِي لأعرفه الآن

অর্থ : মক্কার সে পাথরটিলাকে আমি চিনি, যা নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে আমাকে সালাম দিতো। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৭৭)

সুনানে তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় হযরত আলী রাযি. নবীজীর সাথে মক্কার কোনো একস্থানের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

অর্থ : যে কোনো পাহাড় কিংবা গাছ নবীজীর সামনে পড়তো (তৎক্ষণাৎ) তা বলে উঠতো– আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৬২৬)

পরিশেষে আখেরী নবীর আগমনের সকল আয়োজন যখন সম্পন্ন হলো এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের ঈমানী দাওয়াতের আওয়াজ উচ্চকিত হওয়ার সময় হয়ে এলো, তখন কাফেরদের জন্য নবীজীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্যে কোনো ধরনের কালিমা লেপনের আর সুযোগ রইলো না। একথা বলারও কোনো সুযোগ থাকলো না যে, নবীজী কোনো শিক্ষকের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে এ দাওয়াত দিচ্ছেন...!

হ্যাঁ, ঈমানের এ দাওয়াতকে অস্বীকার করার জন্য তখন কাফেরদের সামনে একটাই প্রতিবন্ধক ছিলো, আর তা হলো তাদের অন্তরের হঠকারিতা ও বক্রতা এবং দুনিয়ার লোভ ও পদমর্যাদার লালসা। অথচ আহলে কিতাব হওয়ায় কাফের ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের খুব ভালো করেই জানা ছিলো যে, মক্কার যমীনে আগমনকারী এই মুহাম্মাদই তাদের তাওরাত-ইঞ্জিলে বর্ণিত প্রতীক্ষিত ফারাকলীত...! যার জন্য দু'আ করে গেছেন হযরত ইবরাহীম আ. এবং যার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন স্বয়ং ঈসা এবং মূসা আ.ও...!

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সময় হল নবুওয়াতী সূর্যোদয়ের

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হারবুল ফিযার

আরব ভূ-খণ্ডে যুদ্ধ ও লড়াই-সংঘাতের ধারা 'প্রাচীন সংস্কৃতি' হিসেবে পূর্ব হতেই অব্যাহত ছিলো। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলো 'হারবুল ফিযার'– যা কেনানাহ এবং কায়স গোত্রের মাঝে সংঘটিত হয়। কেনানাহ গোত্রের শাখা হওয়ায় কুরাইশগণও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। নবীজী আপন চাচাদের সঙ্গে এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা সুহাইলী রহ.-এর মতে নবীজী এ যুদ্ধে কেবল চাচাদের তীর নিক্ষেপণে সহযোগিতা করেছেন। যুদ্ধের সূচনাকালে নবীজীর বয়স ছিল চৌদ্দ, সমাপ্তির সময় বিশ। লড়াইয়ের বয়স হলেও তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি । (সীরাতে ইবনে হিশাম; ১/২২১, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ১/৫২, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; ২/৩১২)

হিলফুল ফুযুল

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ও নির্যাতিত ব্যক্তির সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিতে প্রাচীনকালে 'জুরহুম' গোত্রের তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ফযল ইবনে ফুযালা, ফযল ইবনে ওয়াদাআ ও ফযল ইবনে হারেস- এর উদ্যোগে একটি যুদ্ধবিরতি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রত্যেকের নামের প্রথমাংশ 'ফযল' হওয়ায় এ সন্ধিচুক্তিকে 'হিলফুল ফুযুল' (ফযলদের সন্ধিচুক্তি) বলা হতো। হারবুল ফিযার সংঘটিত হওয়ার চারমাস পর যুবায়ের ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের উদ্যোগে বনু হাশেম, বনু যুহরা এবং বনু তাইম গোত্রত্রয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ'আন নামক এক ব্যক্তির ঘরে সে প্রাচীন সন্ধিচুক্তি 'হিলফুল ফুযুল'-এর নবায়ন করা হয়। চাচাদের সঙ্গে নবীজী স্বয়ং এই শান্তিচুক্তিতে শরীক ছিলেন। এই শান্তিচুক্তিতে অংশগ্রহণ নবীজীর কাছে এতটাই প্রিয় ছিলো যে, নবীজী বলেন,

فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ

অর্থ : আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমাকে লালবর্ণের (উৎকৃষ্ট) উট দেয়া হবে আর আমি তা (উক্ত সন্ধিচুক্তি) ভেঙ্গে ফেলবো..! (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৬৫৫)

(তবাকাতে ইবনে সা'দ ১/৬১, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩১২)

খাদিজা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহ

হযরত খাদিজা রাযি. তৎকালীন আরবের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং ব্যবসায়ী নারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাহেলী যুগে তাকে 'তাহুরা' (পবিত্রা রমণী) নামে ডাকা হতো। নবীজীর সততা আর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তিনি প্রথমত নবীজীকে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে শামে সফর করার আবেদন জানান। গোলাম মাইসারাকে সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করেন। শামে পৌঁছে নবীজী একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসলে 'নাসতুরা' নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রী– যে আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত নবীজীর গুণাবলীর ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলো– নবীজীকে চিনে ফেললো এবং মন্তব্য করলো, এ গাছের নিচে একজন নবীই বসেছেন!

ব্যবসাকার্য সম্পাদন করে কাফেলার সঙ্গে ফিরে আসার সময় সফরসঙ্গী গোলাম মাইসারা দেখতে পান, দু'জন ফেরেশতা নবীজীকে ছায়া প্রদান করছেন। মক্কায় পৌঁছার পর গোলাম মাইসারার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে খাদিজা রাযি. বিষয়টি চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে নাওফেল –যিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং আসমানী কিতাবের আলেম ছিলেন– এর কাছে উত্থাপন করেন। ওরাকা তাকে নিশ্চিত করেন যে, যদি এ বৃত্তান্ত সঠিক হয়ে থাকে, তবে তিনিই শেষ নবী...!

এরপর খাদিজা রাযি. নবীজীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। নবীজী চাচাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে চাচারা সম্মত হন। এরপর বিশটি বকরী মহর নির্ধারণ করে এই শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। নবীজীর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর, আর খাদিজা রাযি. এর বয়স তখন ৪০ বছর। উপরন্তু তিনি ছিলেন বিধবা এবং এটা ছিলো তার তৃতীয় বিবাহ। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলো আবূ হালা, দ্বিতীয় স্বামী ছিলো 'আতীক ইবনে আয়েয। এতদসত্ত্বেও তার চারিত্রিক পবিত্রতা, বংশীয় আভিজাত্য এবং সৌন্দর্যের কারণে মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত যুবক তার পাণি-প্রত্যাশী ছিলো।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদিজা রাযি. ইন্তেকাল করেন। খাদিজা রাযি. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত নবীজী আর কোনো বিবাহ করেননি। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২২৪, তবাকাতে ইবনে সা'দ ১/৬২, আল-ইসতী'আব লি ইবনে আব্দিল বার ৪/৩৭৯, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩১৬, ৩১৯, আল-ইসাবা লি ইবনে হাজার ৮/৯৯, সীরাতে মুস্তফা ১/১০০)

নবীজীর সন্তান-সন্ততি

নবীজীর তিন পুত্র এবং চার কন্যা ছিলো। জন্মগ্রহণের ধারাবাহিকতা অনুসারে তারা হলেন-

১. কাসেম (পুত্র)
২. যয়নব (কন্যা)
৩. রুকাইয়্যা (কন্যা)
৪. উম্মে কুলসুম (কন্যা)
৫. ফাতেমা (কন্যা)
৬. আব্দুল্লাহ (পুত্র), তার উপাধি ছিলো 'তাইয়্যিব' এবং 'তাহের'।
৭. ইবরাহীম (পুত্র)

পুত্র ইবরাহীম ব্যতীত বাকী সকলেই ছিলেন হযরত খাদিজা রাযি. এর সন্তান। আর ইবরাহীম ছিলেন মারিয়া কিবতিয়া নাম্নী নবীজীর এক দাসীর সন্তান। পুত্র তিনজনের প্রত্যেকে শিশু অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন। আর কন্যারা সকলেই পরিণত বয়সে উপনীত হন। (যাদুল মা'আদ ১/১০৩, ফাতহুল বারী; হা.নং ৩৮১৮)

কা'বা পুনঃনির্মাণ

খাদিজা রাযি. এর সঙ্গে বিবাহের দশ বছর পর নবীজীর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, কুরাইশরা কা'বা পুনঃনির্মাণ শুরু করে। সহীহ বুখারীর বর্ণনামতে (হা.নং ১৫৮২) নবীজী স্বয়ং পাথর বহন করে এ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনের প্রসঙ্গ এলে এ সৌভাগ্য অর্জনে গোত্রসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়, এমনকি তা সশস্ত্র লড়াইয়ের রূপ ধারণের আশঙ্কা দেখা দেয়। একপর্যায়ে তারা এ বিষয়ে একমত হয় যে, মসজিদে হারামের একটি 'সিক্কা' (গলিপথ) 'বাবু বনী শাইবা'[৩] বা বনু শাইবার দরজা দিয়ে

৩. নবীজীর যামানায় 'মাতাফের' চারপাশে কোনো দেয়াল বা বেষ্টনী ছিলো না। এতদসত্ত্বেও মসজিদে হারামের নিকটবর্তী কুরাইশদের ঘন বসতিসমূহের মধ্য দিয়ে মসজিদে হারামে

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিবে। আল্লাহর ইচ্ছায় বাবু বনী শাইবা দিয়ে সর্বপ্রথম নবীজী প্রবেশ করেন। নবীজীর আগমন দেখে সকলের কণ্ঠে সন্তুষ্টি ও আনন্দের বাক্য উচ্চারিত হলো– أَتَاكُمُ الْأَمِينُ (তোমাদের নিকট 'আল-আমীন' বিশ্বস্ত এসে গেছে)।

নবীজী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এ বিরোধের সমাধান দিলেন। একটি চাদরের মাঝে হাজরে আসওয়াদ রেখে সকল গোত্রপ্রতিনিধিকে চাদরের প্রান্তসীমা ধরে পাথরটি নির্দিষ্ট স্থানে নিতে বললেন। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন। উপস্থিত সকলেই নবীজীর এ বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত আনন্দচিত্তে মেনে নিলো। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে একটি অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধকে দমিয়ে দিলেন। এ যেন ছিলো বিশ্বমানবতার প্রতি সুস্পষ্ট বার্তা যে, অচিরেই নবুওয়াত-রবির উদয় ঘটবে– যার আলোকচ্ছটায় শত বছরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে যদি গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচিত হতো, তবে তা হতো আরব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ! কেননা, বিষয়টি ছিলো কা'বার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির...!

কা'বা পুনঃর্নিমাণের সময় কুরাইশরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলো যে, এ পবিত্র ঘর নির্মাণে কেবল হালাল সম্পদই ব্যয় করা হবে। এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে গিয়ে হালাল অর্থের স্বল্পতার কারণে ইবরাহীম আ. কর্তৃক নির্মিত কা'বার মূল স্থাপনার প্রায় ছয় থেকে সাত হাত জায়গা পুনঃনির্মাণ থেকে বাদ পড়ে যায়, যা বর্তমানে কা'বা ঘরের উত্তর পাশে অর্ধচন্দ্রাকারের দেয়াল বেষ্টনীতে 'হাতীম' নামে পরিচিত। (বিস্তারিত দেখুন– মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৫৫০৪, তবরানী আওসাত; হা.নং ২৪৪২, মুসনাদে আবূ দাউদ তয়ালিসী; হা.নং ১১৫, আস-সুনানুল কুবরা বাইহাকী; হা.নং ৯২০৮, মাজমাউয যাওয়াইদ; হা.নং ১৩৮৭৯, ১৩৮৮০, ফাতহুল বারী; হা.নং ১৫৮২, ১৫৮৩, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩২১, ৩২৭) তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৩৯৪)

সুবহে সাদিক ঃ সূর্যোদয়ের বার্তা...!

নিকষ রাতের জমাট আঁধারে ছেয়ে থাকা আকাশে 'আত্মপ্রকাশের' জন্য যেমন প্রয়োজন হয় আপন ঔজ্জ্বল্য ও দেদীপ্যমান আলোকিত সৌন্দর্যের, তেমনি আরব্য জাহিলিয়্যাতের গাঢ় তমসায় স্বমহিমায় ভাস্বর হওয়ার জন্য আবশ্যক ছিলো উন্নত ব্যক্তিত্বের।

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবকে নবুওয়াত দান করার পূর্বেই চারিত্রিক উৎকর্ষের এমন অনন্য বিভায় বিভূষিত করেছিলেন, যেমনটি হয়ে থাকে আলোকিত সূর্যোদয়ের পূর্বে সুবহে সাদিকের নির্মল সৌন্দর্যে...! পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি শিরোনাম উল্লেখ করছি-

পরোপকার ও অন্যের হিতকামনা : নবীজীর চাচা আবূ তালেবের চার পুত্র এবং দুই কন্যা ছিলো। আর্থিকভাবে তিনি ততটা স্বচ্ছল ছিলেন না। একবার কুরাইশরা দুর্ভিক্ষের শিকার হলে নবীজী তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে অপর চাচা হযরত আব্বাস রাযি. কে বললেন,

فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله آخذ من بنيه رجلا، وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه

অর্থ : চলুন! আমরা তার কাছে যাই। আমি তার এক পুত্রসন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করবো এবং আপনি একজনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ মর্মে নবীজী চাচাতো ভাই হযরত আলী রাযি. এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আলী রাযি. নবীজীর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৬৪৬৩, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩/২৭)

উত্তম চরিত্র মাধুর্য : হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. ছিলেন নবীজীর গোলাম। পরবর্তীতে নবীজী তাকে আযাদ করে দিয়ে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলায় মায়ের সাথে সফরে গিয়ে লুটেরা দলের হাতে অপহৃত হয়ে মক্কার উকায বাজারে দাসরূপে হযরত খাদিজা রাযি. এর ভাগ্নে হাকীম বিন হিযামের হাতে বিক্রি হন। হাকীম বিন হিযাম ক্রয়কৃত দাস যায়েদকে হাদিয়া হিসেবে ফুফু খাদিজাকে দিয়ে দেন। হযরত খাদিজা রাযি. তা নবীজীকে হাদিয়া দিলে যায়েদ রাযি. নবীজীর দাস হিসেবে গৃহিত হন। কিন্তু 'মুনীবের অনন্য সাধারণ চরিত্র মাধুর্যে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে, যখন তার পিতা এবং চাচা তার সন্ধানে মক্কায় নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেন এবং নবীজীও তাকে বিনা শর্তে চলে যাওয়ার বিষয়টি তার সিদ্ধান্তের উপর ন্যস্ত করেন, তখন তিনি নবীজীর কাছে থাকাকেই গ্রহণ করেন এবং জন্মদাতা পিতা ও স্নেহশীল চাচার উপস্থিতিতেই নবীজীকে সম্বোধন করে বললেন,

أنت مني بمكان الأب والعمّ

অর্থ : আপনিই আমার পিতা এবং চাচার সমতুল্য।

অতঃপর পিতা ও চাচাকে সম্বোধন করে বললেন,

إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا

অর্থ : আমি এই ব্যক্তির (নবীজীর) মাঝে এমন (গুণাবলী) দেখেছি, যার কারণে আমি তার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। (আল-ইসাবা; ২/৪৯৬)

ক্ষমা, উদারতা এবং প্রতিশ্রুতিপূরণে দৃঢ়প্রত্যয় : সুনানে আবূ দাউদের এক বর্ণনায় (হা.নং ৪৯৯৬) এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হামসা নামক একসাহাবী (নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে) একবার নবীজীর কাছ থেকে কিছু ক্রয় করলেন। পণ্যের কিছু অনাদায়ী মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানে আদায়ে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়ে তা নিয়ে আসার অনুমতি নিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু গিয়ে তিনি ভুলে গেলেন। তিনদিন পর মনে পড়ায় যখন তিনি উক্ত স্থানে ফিরে এলেন, তো নবীজীকে সে স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। নবীজী হালকা স্বরে কেবল এতটুকু উষ্মা প্রকাশ করলেন যে,

يَا فَتًى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ

অর্থ : হে যুবক! তুমি আমার উপর কঠোরতা করে ফেলেছো। আমি এখানে আজ তিন দিন যাবত অবস্থান করছি! (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৯৯৬)

লজ্জাশীলতা : জাহিলী যুগে বিবস্ত্র হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে দোষনীয় ছিলো না। এমনকি তখন রেওয়াজ ছিলো যে, বাইতুল্লাহর রক্ষাবেক্ষণকারী কুরাইশরা

প্রবেশের জন্য দরজাসদৃশ কিছু সরু গলি ছিলো। 'বাবু বনী শাইবা' মসজিদে হারামের একটি প্রাচীন গলি বা প্রবেশমুখের নাম– যা মূলত মাকামে ইবরাহীমী'র নিকটে বাইতুল্লাহর দরজা অভিমুখী পাশাপাশি স্থাপিত ভূমি থেকে উঠে যাওয়া দু'টি স্তম্ভের সংযোগে তৈরি তোরণসদৃশ ছিলো। বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জের সময়ও নবীজী এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

যুগে যুগে মসজিদে হারামের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে এ তোরণসদৃশ প্রবেশমুখটি একপর্যায়ে মাতাফের মাঝখানে পড়ে গেলেও মুসলমানরা এ ঐতিহাসিক স্মৃতি সযত্নে সংরক্ষণ করে এসেছিলেন। সর্বশেষ ১৩৮১-১৩৮৯ হিজরী সালে সঊদ সরকার কর্তৃক সংস্কারের সময় এ স্মৃতি মুছে ফেলা হয়...! সম্প্রসারণের পূর্বে এ প্রবেশপথটিকে ' বাবুস সালাম' বলা হতো।

ব্যতীত বহিরাগতদের জন্য বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে হলে কুরাইশী কোনো ব্যক্তির কাপড় নিয়ে তওয়াফ করতে হতো। কুরাইশী কাপড় না জুটলে বিবস্ত্র হয়েই তওয়াফ করতে হতো। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/৩২৮)

এই অবাধ এবং মুক্তমনা পরিবেশেও আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূলকে নির্লজ্জলতা থেকে পবিত্রতা দান করেছিলেন। হযরত আবূ তুফাইল রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, কুরাইশদের সঙ্গে কা'বা পুনর্নির্মাণের সময় নবীজী আপন চাচা আব্বাস রাযি. এর সাথে কাঁধে করে পাথর বহন করছিলেন। কাঁধে পাথর বহন সহজ করার নিমিত্তে (চাচা আব্বাস রাযি.এর নির্দেশে) নবীজীর শরীরের নিম্নাংশের পরিধেয় কাপড় খুলে কাঁধে রাখতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহর পক্ষ হতে এ আওয়াজ এলো, يَا مُحَمَّدُ خَمِّرْ عَوْرَتَكَ অর্থ : হে মুহাম্মাদ! লজ্জা নিবারণ করো।

এরপর আর কোনো দিন নবীজীকে কাপড়হীন দেখা যায়নি। কোনো কোনো বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, কাপড় খুলতে চাওয়া মাত্রই নবীজী লজ্জায় মাটিতে পড়ে যান। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৩৭৯৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫৮২, মাযমাউয যাওয়াইদ; হা.নং ৫৭২৯)

সাহাবী হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. এর সূত্রে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি পাথর বহন করতে গিয়ে কাপড় খুলে গেলে নবীজী তাকে সম্বোধন করে বললেন,

ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة

অর্থ : ফিরে গিয়ে নিজের কাপড় নিয়ে নাও, আর বিবস্ত্র হয়ে চলো না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৮১)

মূর্তির সংস্পর্শ হতে পবিত্রতা : জাহিলী যুগে 'বুয়ানা' নামক একটি মূর্তি ছিলো। বছরের একদিন লোকেরা সে মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে তার নামে পশু জবাই করতো এবং মাথা মুণ্ডন করতো। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, নুবওয়াতের আগে মানসিকভাবে তৈরি না থাকলেও একবার কাফেরদের পীড়াপীড়িতে নবীজী সেখানে উপস্থিত হলে ভয়ার্ত অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং বললেন,

إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح: وراءك يا محمد لا تمسه.

অর্থ : যখনই আমি মূর্তির নিকটবর্তী হয়েছি, দীর্ঘাকৃতির এক শুভ্র ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছি যে, 'হে মুহাম্মাদ! পেছনে ফিরে যাও! তা (এ মূর্তি) স্পর্শ করো না!

এ ঘটনার পর পরবর্তীতে এই পূজা উৎসব আসার আগেই নবীজীকে নবুওয়াত দান করা হয়...! (সিয়ারু আলামিন নুবালা; ১/৬৬)

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, মক্কায় ইসাফ অথবা নায়েলা নামক একটি মূর্তি ছিলো। মুশরিকরা বাইতুল্লাহর তওয়াফকালে তা স্পর্শ করতো। নবীজী (নবুওয়াতের আগে) তওয়াফকালে সঙ্গে থাকা যায়েদ ইবনে হারেসাকে উক্ত মূর্তি স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু যায়েদ বিন হারেসা পরীক্ষামূলক (যে, নবীজী কী বলেন) স্পর্শ করলে নবীজী অসন্তুষ্টির স্বরে বললেন- ألم تنه। অর্থ : তোমাকে কি নিষেধ করা হয়নি...? (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী ১/৪০১)

আরবরা যদিও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করতো কিন্তু আল্লাহর সাথে বিভিন্ন মূর্তি এবং দেব-দেবীকে শরীক করতো এবং সেগুলোর নামে পশু জবাই করতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে নবুওয়াতের আগেও মূর্তির নামে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া থেকে পবিত্রতা দান করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজীর উপর ওহী নাযিলের সূচনা হওয়ার আগেই একবার নবীজীর সামনে গোশতের দস্তরখান পেশ করা হলো। (যেহেতু তা মূর্তির নামে জবাই করা হতো, এজন্য) নবীজী তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮২৬, ফাতহুল বারী ৭/১৪৩)

জাহিলিয়্যাতের সকল আবিলতা থেকে পবিত্রতা : শুধু নির্লজ্জতা থেকেই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে জাহিলিয়্যাতের সমস্ত অন্ধকার থেকেই নিষ্কলুষ রেখেছিলেন। হযরত আলী রাযি. এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী বলেন,

ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بعدها بشيء حتى أكرمني الله برسالته

অর্থ : জাহিলী যুগের লোকদের কোনো অভ্যাসের ইচ্ছাই আমি করিনি দু'বারের ঘটনা ব্যতীত। এ দু'বারের প্রত্যেক বারই আল্লাহ তা'আলা আমার মাঝে এবং ইচ্ছার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। (এ দু'বারের ঘটনার পর) এ ধরনের কোনো মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবুওয়াত দান করেছেন।

অপর বর্ণনায় এ দু'বারের ব্যাখ্যা এসেছে যে, তা ছিলো দু'দিন দুটি বিবাহ অনুষ্ঠানের গান-বাদ্যের আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু আল্লাহর হিকমত যে, নবীজী দু'দিনই উপস্থিত হওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে জাগ্রত হয়েছিলেন...! (মুসনাদে বাযযার; হা.নং ৬৪০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ১৩৮৬৪, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৬৫)

এভাবে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই নবীজী 'খুলুকে আযীম' তথা উত্তম চরিত্র মাধুর্যের এমন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর তুলনা কেবল তিনিই ছিলেন। জাহিলিয়্যাতের নিকষ আঁধারে তিনি ছিলেন মানবতার সূর্য। নির্লজ্জতা আর অরাজকতার তিমিরে তিনি ছিলেন সত্যের মশাল...!

এভাবেই কুদরতের সকল আয়োজন এমনভাবে সম্পন্ন হলো যে, সমগ্র আরবে নবীজী ছিলেন-

- সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ খান্দানের,
- আল-আমীন (বিশ্বস্ত) হিসেবে সমগ্র আরবে পরিচিত,
- হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপনের ঘটনায় গৃহযুদ্ধ বন্ধ এবং হিলফুল ফুযুল সন্ধিচুক্তিতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে শান্তিপ্রিয় হিসেবে স্বীকৃত,
- অসহায় এবং বিপদগ্রস্তের হিতাকাঙ্ক্ষী,
- ব্যবহার এবং চরিত্র মাধুর্যে অনন্য,
- ক্ষমা, উদারতা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে দৃঢ়প্রত্যয়ী,
- নির্লজ্জতা ও বেহায়পনা থেকে পবিত্র এবং
- মূর্তিপূজা, মূর্তির নামে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া, কোনো গান-বাদ্যের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাসহ জাহিলিয়্যাতের সমস্ত আবিলতা থেকে মুক্ত।

এতসব গুণাবলীর পাশাপাশি প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে দুনিয়ার কোনো শিক্ষকের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন। ফলে নবীজী অন্যান্য অনেক আরবের মতই ছিলেন 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর। অক্ষরজ্ঞান নবীজীর ছিলো না। আবার অজ্ঞতা এবং মূর্খতারও কোনো ছাপ তার পূত-পবিত্র জীবনে ছিলো না। কেননা, তিনি তো ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরবিয়তে প্রতিপালিত...!

(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রন্থ পরিচিতি

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. লিখিত

লা-মাযহাবী ফিতনা বিষয়ক কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

বর্তমানে দেশের ধর্মীয় পরিস্থিতি খুবই অস্থিতিশীল। ধর্মের লেবাসধারী ভণ্ডদের ব্যবসা-বাণিজ্য বড়ই রমরমা। বাতিল আর মিথ্যার তর্জন-গর্জনে হক আর সত্য যেন ম্রিয়মান। বিষের বোতলে মধুর লেবেল লাগানোর প্রতিযোগিতা এখন সর্বত্র। সর্বসাধারণের ধর্মীয় দৈন্যতার সুযোগে তাদের দীন-ঈমান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত। বিশেষত 'আহলে হাদীস' নামধারীদের দৌরাত্মে মাযহাবের অনুসারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-র পথচলা থমকে যাওয়ার উপক্রম। দীনের ছোট-খাটো মুবাহ-মুস্তাহাব সংক্রান্ত মতবিরোধপূর্ণ মাসাইলকে সম্বল করে ওদের হীন ষড়যন্ত্রে উম্মাহ দ্বিধাবিভক্ত। আহলে হাদীস, সালাফী, মুহাম্মাদী ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর শিরোনামে সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা তুঙ্গে। ফলে দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ আজ ওদের বিভ্রান্তির শিকার। এই নাযুক মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহকে এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে বাঁচাতে ও এদের মুখোশ উম্মোচন করে দিতে যে সকল আলেমে দীন উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন– হারদুঈ হযরত মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ. এর সুযোগ্য খলীফা, প্রখ্যাত আলেমে দীন, দেশ ও জাতির আধ্যাত্মিক রাহবার, ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস, মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.। তিনি বয়ান-বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এদের মুখোশ উন্মোচনে বদ্ধপরিকর। হযরতের বর্তমান বয়ান-বক্তৃতা ও লেখনীর প্রধান বিষয়বস্তুই হলো 'লা-মাযহাবী ফিতনা : মোকাবেলার পথ ও পন্থা'। এ পর্যন্ত হযরত এ বিষয়ে শতাধিক বয়ান-বক্তৃতা উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। রচনা করেছেন চার চারটি কিতাব। এ বিষয়ক হযরতের আরো দু'টি কিতাব প্রকাশের পথে ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ, হযরতের এ কিতাবগুলো এতোটাই ক্রিয়াশীল, উপকারী ও ফলদায়ক যে, যেখানেই এগুলো পৌঁছেছে আগুনে পানি পড়ার ন্যায় এই মহামারী ও ফিতনার আগুন নির্বাপিত হয়েছে।

কিতাবগুলোর নাম

১. মাযহাব ও তাকলীদ
২. তুহফাতুল হাদীস
৩. হাদীসে রাসূল স.
৪. হাদিয়া আহলুল হাদীস
৫. পুরুষের নামাযের একশত মাসায়িল (যন্ত্রস্থ)
৬. হাদীসে রাসূল স. ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

 # মাযহাব ও তাকলীদ

মুহতারাম লেখক তার কিতাবকে এভাবে সাজিয়েছেন-

প্রথমে তিনি ইসলামী শরীয়াতের উৎস চতুষ্টয় তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস নিয়ে সারগর্ভ ও প্রামাণ্য আলোচনা পেশ করেছেন। যা পাঠ করলে পাঠক নির্দ্বিধায় মানতে বাধ্য যে, শরীয়তের দলীল ৪টি; শুধু কুরআন আর সুন্নাহ নয়।

এরপর তাকলীদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন- তাকলীদ কী ও কেন, তাকলীদ করা জরুরী কেন, তাকলীদ করতে আমরা বাধ্য কেন। দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তাকলীদ কোন নতুন সৃষ্ট বিষয় নয়; এটি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা চৌদ্দশ বছর যাবত উম্মাহর ধারাবাহিক কর্মপন্থা। এটি কোন শিরকী বিষয় নয়; বরং এটি আল্লাহ তা'আলার আদেশ।

তিনি দেখিয়েছেন, এ যাবতকালের সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ আলেমে দীন তাকলীদ করেছেন। বর্তমানে চার মাযহাবের বাইরে কোন মাযহাব কায়েম করার সুযোগ নেই। চার মাযহাবের কোন একটি মানা আবশ্যক। মাযহাব না মানলে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করা সম্ভব নয়।

তারপর পেশ করেছেন হানাফী মাযহাবের উৎস, 'হানাফী মাযহাবের ভিত্তি যয়ীফ হাদীসের উপর' এই দাবীর অসারতা, হানাফীদের উপর উত্থাপিত ডজন খানেক অবান্তর প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব, ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. এর শ্রেষ্ঠত্ব।

তারপর প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও শ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন।

এছাড়াও আছে মাযহাব ও তাকলীদ সংক্রান্ত ওদের চাপানো বহু বিষয়ের সন্তোষজনক জবাব।

 # তুহফাতুল হাদীস

মজবুত বাঁধাই, ঝকঝকে অফসেটে ছাপায় ১৮২ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান কিতাবটি ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এক অনবদ্য সংকলন; যে বিষয়গুলো নিয়ে লা-মাযহাবী বন্ধুরা আজ জনমনে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে যে, এ বিষয়ে হানাফীদের কোন দলীল নেই বা থাকলেও তা দুর্বল অথবা জাল ।

লেখক এখানে মাসআলাসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমে তিনি হানাফীদের দলীল পেশ করেছেন। এরপর লা-মাযহাবীদের দলীলগুলো উত্থাপনপূর্বক সেগুলোর দুর্বলতা ও অসারতা প্রমাণ করেছেন। তারপর হানাফীদের দলীলের উপর উত্থাপিত সব ভিত্তিহীন অভিযোগের অপনোদন করেছেন।

প্রতিটি মাসআলায় এই পরিমাণ সহীহ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, পাঠকমাত্র এর উপর নির্ভর না করে কোন উপায় নেই।

কিতাবে আলোচিত ১৫টি বিষয় এই-

১. নামাযে মুসল্লীগণ কীভাবে দাঁড়াবেন।
২. নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা ও নাভির নিচে হাত বাঁধা।
৩. নামাযে একাধিকবার রফয়ে ইয়াদাইন করার বিধান ।
৪. ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান।
৫. সূরা ফাতিহার পর আমিন আস্তে বলা সুন্নাত।
৬. রুকূ থেকে সেজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা।
৭. বিতর নামায প্রসঙ্গ।
৮. শরয়ী প্রমাণপঞ্জির আলোকে তারাবীহর রাকআত সংখ্যা।
৯. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাযা নামায।

১০. ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর।
১১. জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান।
১২. পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য।
১৩. পুরুষদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ : শরীয়ত কী বলে।
১৪. ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার শরয়ী বিধান।
১৫. এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দেয়ার শরয়ী বিধান ।

বইটির শেষে 'আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরয' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

কেউ বলতে পারেন, লা মাযহাবীদের অনেক বিষয় আছে, যা চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হয়, তাহলে কি ঐসব মাযহাবের অনুসারীরাও ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে?

এ প্রশ্ন সমাধান করতে কিতাবের ভূমিকাতে নজর দিন। দূরদর্শী লেখক সেখানে এর চমৎকার ও যথার্থ জবাব দিয়েছেন।

 # হাদীসে রাসূল (১ম খণ্ড)

১২৬ পৃষ্ঠার মধ্যম কলেবরের এই মূলবান 'হাদীসে রাসূল' কিতাবে লেখক সন্নিবেশিত করেছেন ১০৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক হাদীসে রাসূল। এর সিংহভাগ বিষয়ই হলো, যেগুলো নিয়ে লা-মাযহাবী বন্ধুরা এই প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে যে, এ বিষয়ে হানাফীদের কোন সহীহ হাদীস নেই ; সব যয়ীফ, জাল-মঊযু। লেখক এসব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম কায়েম করে প্রতিটি শিরোনামের অধীনে সহীহ হাদীস এনে দেখিয়েছেন যে, তাদের ঐসব দাবী সর্বৈব মিথ্যা, অসার ও ভিত্তিহীন। কিতাবটির সংকলননীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, বর্তমান বাজারে প্রচলিত গতানুগতিক ধারার বিপরীতে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রমাণসিদ্ধ কিতাব, যাতে মুসলমানদের মাঝে বাহ্যত মতবিরোধপূর্ণ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ছাড়াও স্থান পেয়েছে এমন কিছু গুনাহের আলোচনা, যা মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকহারে বিরাজমান।

কিতাবটির নাম 'হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' হলেও এতে শুধু কিছু হাদীস জমা করে দেয়া হয়েছে এমন নয়, বরং নির্দিষ্ট একটি নীতিমালার আলোকে মাসাইলসমূহকে প্রমাণসিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এ ধরনের রচনা বাংলা ভাষায় এটি প্রথম না হলেও প্রথম সারির অবশ্যই।

আমাদের ধারণা কারো সংগ্রহে কিতাবটি থাকলে কখনোই সে লা-মাযহাবীদের ধোঁকা ও প্রপাগাণ্ডার শিকার হবে না এবং গুনাহে কবীরা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সে মজবুত হিম্মত করবে ইনশাআল্লাহ।

 # হাদিয়া আহলুল হাদীস

এ কিতাবটি মূলত 'লা-মাযহাবী ফিতনা : মোকাবেলার পথ ও পন্থা' বিষয়ে হযরতের প্রদত্ত শতাধিক বয়ান থেকে বাছাই করা ৪টি বয়ানের সংকলন। আলহামদুলিল্লাহ ইতোপূর্বে বয়ান চারটি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আল-আবরার' ও 'দ্বি-মাসিক রাবেতা'-এ প্রকাশিত হলে সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। পাঠকমাত্রই অকল্পনীয় উপকৃত হয়। সকলের পক্ষ থেকে কিতাব আকারে প্রকাশ করার বারবার দাবী আসতে থাকে। তাদের দাবী পূরণে ও এর ফায়দাকে আরো ব্যাপকতর করতে ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্যম কলেবরে ঝকঝকে অফসেট পেপারে মাকতাবাতুল মানসূর থেকে 'হাদিয়া আহলুল হাদীস' নামে প্রকাশিত হয়েছে ।

হযরত এই বয়ানগুলোতে প্রমাণসহ পেশ করেছেন আহলে হাদীস ফিতনার সূচনা ও ইতিহাস। মুখোশ উম্মোচন করে দিয়েছেন তাদের সকল ধোঁকাবাজী, জালিয়তী ও প্রোপাগাণ্ডার।

এদের ফিতনা থেকে বাঁচতে আমাদের করণীয় কী ও গোটা মুসলিম মিল্লাতকে বাঁচাতে উলামায়ে কেরামের কী কী পদক্ষেপ নেয়া জরুরী তা-ও লেখক সবিস্তারে সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরেছেন।

 # পুরুষের নামাযের ১০০টি মাসায়েল

এই কিতাবটির কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে। আল্লাহর তাওফীক শামিলে হাল হলে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। এই কিতাবে লেখক হানাফী মাযহাব মতে একজন পুরুষের নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বিশেষ ১০০টি মাসআলা ও আমলের প্রয়োজন হয় সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম কায়েম করে তার অধীনে ব্যাপক উদ্ধৃতিসহ সহীহ হাদীস পেশ করেছেন।

 # হাদীসে রাসূল (২য় খণ্ড)

এই কিতাবটির কাজও খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। এটি প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্যসহ নতুন পঞ্চাশোর্ধ বিষয়ের এক অনবদ্য সংকলন।

প্রিয় পাঠক! মূল্যবান ও জরুরী এ কিতাবগুলো সংগ্রহ করতে ভিজিট করুন-

www.darsemansoor.org
www.muftimansoor.com

আর মলাটবদ্ধ কিতাব সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন– ০১৬৮৭১৮০৮৩৪, ০১৯১১৩৫৩২৮১।

লা-মাযহাবী ফিতনা মোকাবেলায় ও এদের খপ্পর থেকে বাঁচতে হযরতের এসকল কিতাবের পাশাপাশি আরো যে সব কিতাব আমরা সংগ্রহে রাখতে পারি তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

১. তোহফায়ে আহলে হাদীস
-মুফতী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ.
২. মাযহাব ও তাকলীদ কী ও কেন?
-মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, ভাষান্তরঃ মাওলানা যাইনুল আবেদীন দা.বা.
৩. উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা
-মাওলানা আবদুল মালেক দা.বা.
৪. নবীজীর নামাজ
-ড. ইলিয়াস ফয়সাল, ভাষান্তরঃ মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ দা.বা.
৫. দলীলসহ নামাযের মাসায়িল
-মাওলানা আব্দুল মতিন দা.বা.
৬. মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম পরিত্যাগ
-শাইখ যাহিদ হাসান আল-কাউসারী, ভাষান্তরঃ মুফতী মনিরুল ইসলাম দা.বা.
৭. আহলে হাদীস যুগে যুগে
-মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী দা.বা.
৮. হানাফী মাযহাবের সুদৃঢ় দলীল প্রমাণ
-মুফতী হাসান সিদ্দীকুর রহমান দা.বা.
৯. তাকলীদ ও মাযহাব প্রসঙ্গ
-মুফতী হিফযুর রহমান কুমিল্লায়ী দা.বা.
১০. আহাফি
-রশীদ জামীল দা.বা.

এছাড়াও এ বিষয়ে হক্কানী উলামায়ে কেরামের ছোট-বড় বহু গ্রন্থ এখন বাজারে এসে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে হক্কানী উলামায়ে কেরামের মহব্বত দান করুন। তাদের সাথে মজবুত সম্পর্ক রাখার তাওফীক নসীব করেন। এ বিষয়ে তাদের লেখা কিতাবসমূহ বিশেষ করে মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর কিতাবসমূহসহ উল্লিখিত কিতাবগুলো বেশি বেশি অধ্যয়ন করার তাওফীক দান করুন। গোটা মুসলিম উম্মাহকে সকল চক্রান্ত থেকে হিফাযত করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

লেখক : শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, পান্তাপাড়া, সদর যশোর

পা নি ন য় ! ম রী চি কা

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৭

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড; অশিক্ষিত লোক পশুর সমতুল্য– এ জাতীয় প্রবাদ সর্বজন স্বীকৃত বটে। কিন্তু বাস্তবে কোন্ শিক্ষা জাতির জন্য মেরুদণ্ড এবং কোন্ শিক্ষা মানুষকে পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করে– এ বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষ চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে। সে বিভ্রান্তির সমাধান আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। আজকের আলোচনা আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে।

বর্তমানে অধিকাংশ লোকের ধারণা বরং দৃঢ় বিশ্বাস এ রকম যে, জাগতিক শিক্ষায় রয়েছে মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি, সুখ-সমৃদ্ধি। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মানে দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিতা, অভাব-অনটন ও অশান্তি। বিশেষ করে উপমহাদেশের দেওবন্দী নেসাবের শিক্ষা, যার কোন সরকারি সনদ নেই। ফলে এদের কর্মক্ষেত্র শুধু বেসরকারি মসজিদ-মাদরাসা, যা জনগণের স্বেচ্ছা অনুদান ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। উপরন্তু মসজিদ-মাদরাসাটি যদি হয় কমিটি নিয়ন্ত্রিত, তাহলে স্টাফদের বেতন-ভাতার বিষয়ে তাদের যে কোষ্ঠকাঠিন্য তা তো সকলেরই জানা। এ বিশ্বাসের ফলেই নিজেদের সন্তানাদি, ভাই-বেরাদারকে এ শিক্ষাধারা থেকে দূরে রেখে জাগতিক শিক্ষা বা অন্তত সরকারি মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। কওমী ও দেওবন্দী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন, এ ধারায় লেখা-পড়া করে এরা খাবে কোত্থেকে? চলবে কেমন করে! যদিও এ জাতীয় প্রশ্নের মূল উৎসের সন্ধান করতে গেলে আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা এ মর্মে ঈমানের বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া চিরস্থায়ী পরকালের মান-মর্যাদা, শান্তি ও উন্নতির প্রত্যাশা কোন শিক্ষায় বেশি– এ প্রসঙ্গ না হয় তোলাই রইল। কিন্তু জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ করলেই কি নিশ্চিত ভালো রোযগার? ভালো রোযগার হলেই কি উন্নতি? উন্নতি হলেই কি শান্তি? অপরদিকে সার্টিফিকেট বিহীন দীনী শিক্ষায় আসলেই কি বেকারত্ব? কিংবা অভাব ও অশান্তি? এ জাতীয় প্রশ্ন তোলার যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে ‘চিলে কান নিয়েছে’ শুনে কানে হাত না দিয়েই দৌড় দেয়ার মত নয়; বরং চোখ-কান খুলে ভালোভাবে দেখেশুনে উত্তর দিতে হবে। তখন দেখা যাবে যে, অধিকাংশ প্রশ্নের জবাবই না-বাচক। এমন না-বাচক জবাবের স্বপক্ষে দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। আজ নমুনা হিসেবে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। (পরবর্তীতে আরো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হবে ইনশা-আল্লাহ)

একজন বিশিষ্ট বুযুর্গের নেক নযরের ফলে একটি বংশে সকলেই আলহামদুলিল্লাহ দীনদার। এ বংশের দ্বিতীয় প্রজন্মের একজন ছাড়া বাকি সকলেই দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত। কীভাবে কী কারণে তিনি জাগতিক শিক্ষাধারায় গেলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানা নেই। আমাদের যখন পড়ালেখা শুরুর বয়স, তখন তিনি ঢাকার এক ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। পাশাপাশি দু-চারটা প্রাইভেট-টিউশনি করেন। কিছুদিন পর অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাকরীতে যোগদান করেন।

ধর্মে-কর্মে তেমন মনোযোগ নেই। কার্লমার্কস ও লেলিনের দর্শনের নিয়মিত পাঠক। তার টেবিলে থাকত ম্যাক্সিম গোর্কি, রবি ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ জাতীয় বই-পুস্তক। একটা ট্রাঞ্জেস্টারও ছিল– যার মাধ্যমে তিনি মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র মানুষ। তার মত নম্র-ভদ্র, সৎ মানুষ অনেকটা বিরল। এ সকল বৈশিষ্ট্যে তিনি এ বংশের আলেমদের চেয়েও অনেক এগিয়ে। ফলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু তিনি সর্বদা পেরেশান থাকতেন। নিজ ভ্রাতৃদ্বয় ও চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো ভাইদের কওমী মাদরাসায় পড়া নিয়ে বলতেন, এরা ভবিষ্যতে করবেটা কী! এদের কেউ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে বলতেন, তুই কওমী মাদরাসায় পড়ার পাশাপাশি আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দে; সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো। মাঝে-মধ্যে ছোট ভাইদের মাথার টুপি খুলে সামনে রেখে দিতেন আর বলতেন, মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা হতে দে, বিকালবেলা একটু খেলাধুলা কর। প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রম সম্পর্কে সুযোগ পেলেই নেতিবাচক তর্ক জুড়ে দিতেন। বলতেন, এসব অনর্থক; কাজ-কাম কিছু নেই তো, তাই বেকার ঘোরাফেরা। নিজেরাই জানে ঘোড়ার ডিম, আবার অন্যদেরকে বুঝায়! যার যার দীন সে পালন করবে; অন্যদেরকে এত পটানোর দরকার কী? ছোটদের কেউ এ সকল মন্তব্যের জবাব দিতে চেষ্টা করলে এই বলে থামিয়ে দিতেন যে, তোরা এখন এগুলো বুঝবি না; বড় হলে বুঝবি।

বছরের পর বছর সচিবালয়ে চাকরী করছেন। বিবাহের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন আগ্রহই নেই। বাবা-মা ও মুরুব্বীরা এ মর্মে কিছু বললে মুচকি হেসে বলতেন, আরও পরে দেখা যাবে। বন্ধু-বান্ধবরা ধরলে বলতেন, আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিই, তারপর বিবাহ।

একজন সৎ চাকরিজীবি হিসেবে সুনাম থাকায় অভিভাবকদের কাছে অনেক দিক থেকে প্রস্তাব আসতে থাকলেও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নেই কারো। কেননা তার

তরফ থেকে সামান্যমাত্রও সাড়া নেই। অবশেষে সকলেই তার চিন্তা বাদ দিয়ে পরবর্তীজনের বিবাহ-শাদীর চিন্তা করেন এবং দেখেশুনে এক আলেম পরিবারে বিবাহ করিয়ে দেন। সঙ্গত কারণেই তার ছোট ভাইয়ের এক-দুটো সন্তান হওয়ার পর ধীরে ধীরে তার বিবাহের আগ্রহের কথা জানা যায়। শর্ত হলো, পাত্রী চাকুরিজীবি হতে হবে। কারণ তার একার চাকরিতে নাকি সংসার চালানো সম্ভব নয়। এ বংশের জন্য এটা ছিল এক আজব কথা। চাকরি করা বউ চায়, এ আবার কেমন মরদ!

আরো কিছুদিন পর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময় তিনি একটি মেয়ের ছবি নিয়ে গেলেন। মায়ের কাছে ছবিটি দিয়ে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ। কপালে তিলক পরা হবুবধূর হাস্যোজ্জ্বল ছবি দেখে আর মুচকি মুচকি হাসে, অন্যদেরকেও দেখায়। এ মেয়েটিও সরকারি চাকরি করে; কাজেই ছেলে একে বিবাহ করতে আগ্রহী। এসব কথা অন্যদেরকে শোনায়। কোথায় তাদের গ্রামের বাড়ি, কী তার শেকেল-সূরত এসব নিয়ে খোঁজ-খবর করার গরজ কেউ দেখায়নি। সবার একটাই কথা, ও যে বিবাহ করতে চেয়েছে এ-ই ঢের। কাজেই শুভকাজে আর যেন দেরী না করে এবং কারো জন্য অপেক্ষাও না করে। সুতরাং এ পক্ষের দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়েই তিনি বিবাহ সম্পাদন করেছেন। নিকটাত্মীয় বা অভিভাবকদের উল্লেখযোগ্য কেউ এ বিবাহে উপস্থিত ছিল না।

বিবাহের পর দু'রুমের সরকারি বাসা পেয়েছেন। সেখানে দু'জনের রাত্রিবেলার সংসার আর দিনের বেলা তালা। বয়সকালের স্ত্রী! ফলে রূপ-লাবণ্য আর রস-রসিকতায় তার আগ্রহও ছিল না, শর্তও ছিল না। একদম সাদামাটা ও দায়সারা সংসার। আছে শুধু চাকরি, আর চাকরির স্বার্থে অফিসে যাওয়ার আগে একটু সাজগোজ ও ফর্মাল বিউটিফিকেশন। অফিস-টাইমের বেশভূষায় স্ত্রীকে হয়ত ভালোই মনে হতো; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো স্বামীর জানা, আর সে প্রকৃতি নিয়েই স্বামীর সাথে থাকা। অথচ স্বামী বেচারা বেশ সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এ নিয়ে স্ত্রীর মনে অনেক টেনশন থাকলেও স্বামীটি অতিভদ্র হওয়ায় তিনি নিজ স্ত্রীর প্রতি অনাগ্রহকে মন থেকে অনেক দূরে রাখতে চেষ্টা করতেন। এতদসত্ত্বেও এ মহিলার মনে খামাখাই একটা দুশ্চিন্তা লেগেই থাকে। ফলে কিছুদিন পর পর সে ভারসাম্যহীন হয়ে পাগলের মতো হয়ে যায়।

তাদের দু'টি সন্তান। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবাকেই পিতা-মাতা উভয়ের ভূমিকা পালন করতে হয়। সন্তানদের লালন-পালনে তারা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি যত্নবান। চেষ্টা করছেন একদম হাতে গড়ে তৈরি করতে। অতিরিক্ত যত্ন ও নিয়ন্ত্রণের ফলে সন্তানগুলোকে ফার্মের বলে মনে হয়।

বর্তমানে তিনি চাকরি শেষে অবসরে আছেন। অনেকে এসময় অন্য চাকরি-বাকরি খোঁজেন। কিন্তু নিজ পরিবারের চাকরিতেই তিনি এত ব্যস্ত যে, অন্যত্র চাকরি করার চিন্তা করাও মুশকিল। তার ওয়াইফ সম্ভবত এখনো চাকরি করছেন। সকলের ধারণা ছিল, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই যেহেতু পদস্থ সরকারি চাকরিজীবি, সেহেতু ঢাকায় তাদের গাড়ি-বাড়ি থাকবে, দুনিয়াদারীতে অন্তত নিজ ভাই-বংশের সকলের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবেন, অবসরে গিয়ে হজ্জ-উমরা করবেন; কিন্তু এ জাতীয় কিছুই নজরে পড়ছে না। বর্তমানে থাকেন ভাড়া বাসায়। দু'বছরে একবার বাড়িতে আসেন। বাড়িতে আসলে ভাইদের কারো ঘরে মেহমান হিসেবে এক-দু'দিন থাকেন। বাড়িতে খালি ভিটা পড়ে আছে; চাইলে একটা ঘর তুলতে পারেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অর্থনৈতিক সমস্যাই এক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে। তবে একথা সম্পূর্ণ সঠিক যে, ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজ সততার সাথে একটু আপোষ করে চললে তার গাড়ি-বাড়ি সবই করা সম্ভব ছিল। সততার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ছাড় না দেয়াতে সংসার চালাতেই কষ্ট হচ্ছে, বাড়ি-গাড়ি আর হজ্জ-উমরা তো দূরের কথা!

পক্ষান্তরে দীনী মাদরাসায় পড়া তার ভাইদেরকে আল্লাহ তা'আলা শুধু ঘর নয়; পৃথক বাড়ি তৈরির তাওফীকও দিয়েছেন। তারা অনেকেই বারবার হজ্জ-উমরা করছেন। তাদের সন্তানাদি হাফেয-আলেম হচ্ছে। জাগতিক দিক থেকেও প্রায় সকলেই তার চেয়ে ভালো অবস্থানে আছেন। এই দীনী লাইন আর মসজিদ-মাদরাসাতেই খুব সম্মানের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিক ও উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। পৃথকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য বা রুটি-রুজির ধান্ধা তাদের করতে হচ্ছে না। যদিও মাদরাসা শিক্ষিতদের জন্য মসজিদ-মাদরাসার খিদমত বাদ দিয়ে রুজি-রোযগারের ধান্ধা করা মোটেও নিষেধ নয়; রাষ্ট্রীয়ভাবেও নয়, শরঈভাবেও নয়। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের কাজে তাদেরকে এতই ব্যস্ত রাখছেন যে, তারা চাইলেও এর জন্য সময় বের করার কোন সুযোগ নেই। এলাকার মধ্যে তাদের যে সম্মান ও সুখ্যাতি তা রীতিমত ঈর্ষণীয়। তাদেরকে দেখে এলাকার সচেতন লোকেরা তাদের সন্তানদেরকেও দীনী শিক্ষায় নিয়োজিত করছে এবং এর সুফলও পাচ্ছে। বিভিন্ন মৌসুমী ছুটি উপলক্ষে যখন তারা নিজ এলাকায় ফিরে আসে তখন তাদের প্রশান্ত পদচারণায় গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। এলাকার গরীব-দুঃখীরা এদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা পায়। তাদের কারণে সমাজে তাদের বাবা-মায়েরও মুখ উজ্জ্বল হয়।

আসলে রুটি-রুজি, শান্তি ও উন্নতি যে জাগতিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তাকদীর ও চেষ্টার উপরে নির্ভরশীল— এ বিষয়টি অনেকে মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করেও দেখে না। অযথাই কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে দীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এবং সন্তানদের দীন-দুনিয়া, নীতি-নৈতিকতা সবকিছুই চরম ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। দুনিয়াতেই এদের অভিভাবকরা এদের কাছে নির্মমভাবে উপেক্ষিত হয়। আর পরকালে তো তারা নিজেরাই হবে রিক্তহস্ত; বাবা-মাকে আর কী দিবে? আল্লাহ পাক মুসলিম সামজকে এ বাস্তবতা বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আবূ তামীম

কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা বৈষম্য নয়

মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষকেও সৃষ্টি করেছেন, নারীকেও সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের আখেরাতের শান্তির জন্য যেমন নেক আমল করা জরুরী, তেমনি জরুরী দুনিয়ার শান্তির জন্য কর্ম-তৎপর হওয়া। কর্মের জন্য দুই ধরনের বস্তুর উপস্থিতি প্রয়োজন। (১) জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, বিবেক, হেকমত, কৌশল প্রভৃতি আত্মিক যোগ্যতা। (২) বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পরিশ্রম করার শারীরিক যোগ্যতা।

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই উভয় যোগ্যতায় তারতম্য এবং ভিন্নতা রেখেছেন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবেই নারী-পুরুষের কর্ম প্রেরণা ও আগ্রহ-আকর্ষণ ভিন্নমুখী।

অপরদিকে কর্মের ময়দান ও ক্ষেত্রও দু'টি। (১) গৃহাভ্যন্তরের কাজকর্ম। (২) গৃহ-বহির্গত কাজ। নারীর উপর যেহেতু পর্দা, নিজের সতীত্বের হিফাযত, নিজ ও স্বামীর সম্পদের হিফাযত, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতির যিম্মাদারী রয়েছে, এজন্য ঘরের ভিতরটাই কর্মক্ষেত্র হওয়া তার দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক।

আর পুরুষের উপর যেহেতু জীবিকা নির্বাহ করা, বাজার-ঘাট করা এবং পরিবার-পরিজনের খোরপোশের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আছে এজন্য ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্র হওয়া তার দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক।

কর্ম বণ্টনের এই পদ্ধতি প্রকৃতিগত, বাস্তবসম্মত এবং শরীয়ত সমর্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থ : তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি। যাতে একে অপরকে সেবাদানকারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। (সূরা যুখরুফ- ৩২)

অর্থাৎ আমি আমার অপার প্রজ্ঞার দ্বারা বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি পূরণের ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সকল মানুষ পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে গোটা সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। (মুহিউদ্দীন খান অনুদিত মা'আরিফুল কুরআন; পৃষ্ঠা ১২২৭)

ঘরের ভেতর নারীর কর্মক্ষেত্র হওয়াটা তার জন্য বৈষম্য নয় রহমত। অপমান নয় সম্মান। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের জন্য তাকওয়ার পর সবচেয়ে উত্তম বস্তু সাব্যস্ত করেছেন নেককার স্ত্রীকে। এর অন্যতম কারণ হলো, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তার সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে কল্যাণকামী হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন তাকওয়ার পর নেক স্ত্রীর তুলনায় উত্তম কোন জিনিস লাভ করতে পারে না-

(১) যে স্ত্রীকে নির্দেশ করলে মান্য করে।
(২) নেক দৃষ্টি দিলে আনন্দিত করে।
(৩) তার ব্যাপারে শপথ করলে শপথ থেকে তাকে উদ্ধার করে (যেজন্য শপথ করেছিল তা বাস্তবায়ন করে)।
(৪) স্বামী অনুপস্থিত হলে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদের যথার্থ হিফাযত করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৫৭)

ঘরের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনের কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নারীদেরকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, উটের উপর সওয়ার নারীদের মাঝে সবচে শ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংশীয় নেক স্ত্রীগণ যারা শৈশবকালে সন্তানদের লালন-পালনে সবচে সহানুভূতিশীল হয় এবং নিজ স্বামীর ব্যাপারেও হয় খুবই যত্নবান। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৩৬৫)

তাছাড়া স্বামীকে যখন পরিবার-পরিজনের খোরপোশ, আবাসন, সন্তানদের শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করার যিম্মাদারী দেয়া হলো, তখন তাকে অফিসে যেতে হয়, দোকানে যেতে হয়, ক্ষেত-খামারে যেতে হয়, রাস্তা-ঘাটে চলতে হয়, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অতঃপর যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং ঘর্মাক্ত হয়ে বাসায় ফেরে তখন স্ত্রীর একটু নেক দৃষ্টি, একটু হেল্প, এক গ্লাস পানি দূর করে দিতে পারে স্বামীর সারাদিনের কষ্ট, ক্লান্তি। স্ত্রীর সামান্য আন্তরিকতা বয়ে আনতে পারে স্বামীর হৃদয়ে অনেক প্রশান্তি।

আর যদি স্ত্রী ঘরেই না থাকে; বরং সেও একইভাবে অফিস-আদালত থেকে টায়ার্ড হয়ে আসে, তখন কে কার সাহায্য করবে? কে কার কষ্ট দূর করবে? শান্তি তখন কোথায় পাওয়া যাবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে। আর সেই সত্তা থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়; যাতে তার কাছে স্বস্তি পেরে পারে। (সূরা আ'রাফ- ১৯০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে আন্তরিক প্রশান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রুম- ২১)

একটি প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন দায়িত্বশীল থাকে। প্রত্যেকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে শান্তি এবং নিয়ম-শৃংখলা থাকবে। কিন্তু যখনই তারা নিজেদের দায়িত্বে অবহেলা করবে তখনই তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে, প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তেমনিভাবে গৃহের সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত থাকে গৃহিণীর উপর। গৃহিণী দায়িত্বশীল না হলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গৃহিণী হলো স্বামীর গৃহের দায়িত্বশীল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২০০)

উপরন্তু গৃহিনী যদি গৃহ ছেড়ে অফিস-আদালত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে প্রথমে সে নিজে, এরপর পরিবার, সমাজ, দেশ অশান্তির আগুনে দাউদাউ করে জ্বলবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না। (সূরা আহযাব- ৩৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী গোপনীয় বস্তু। যখনই সে বের হয় তখন শয়তান তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৭৩)

অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে আমাদের নারী সমাজ কুরআন-হাদীসের কথা উপেক্ষা করে পশ্চিমা বিশ্বের অন্ধ অনুকরণে ঘর থেকে বের হয়ে নারীত্ব, সতীত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও গৌরব হারাচ্ছে। ঘরে হয়তো তাকে একজন পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জন করতে হতো; এখন বাইরে তাকে হতে হয় বহু পুরুষের লালসার শিকার। শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, আশ্চর্য তামাশার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায় তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা। পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশ' পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসার শিকার হয় তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা। (ইসলাহী মাওয়ায়েয; পৃষ্ঠা ১৫৪)

পৃথিবীর সকল প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা এবং সকল ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা এ বিষয়ে একমত যে, মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য। আর নারীই হলো পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু।

নারীর বাইরে আসা আর কর্মজীবি হওয়ার কারণে ইউরোপ-আমেরিকার পারিবারিক ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। একে তো পুরুষরা বিবাহবিমুখ হয়ে পড়েছে; তদুপরি কোন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হচ্ছে না। এমন স্বামী বা স্ত্রী খুবই কম পাওয়া যাবে, যে বলতে পারবে এটা তার প্রথম বিবাহ। সন্তানরা খুব কমই আপন মা বা বাবাকে কাছে পায়। এর প্রধান কারণ হলো, স্ত্রী অর্থ উপার্জন করে সংসারে অর্থের যোগান দিচ্ছে; কিন্তু বহির্মুখিতার কারণে স্বামীর প্রতি কাঙ্ক্ষিত আকর্ষণ থাকছে না বা তাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে না। ফলে পুরুষ ঘরের বাইরের জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীও শেষ পর্যন্ত একই পথে পা বাড়ায়। ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস এমন চরম আকার ধারণ করে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে তাদের অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা হয় সবচে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা ব্যাপক হারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সহিংস অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এভাবেই নারীর বহির্মুখিতার কারণে ধীরে ধীরে সমাজব্যবস্থা এগিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে।

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ জন সিমন বলেন, নারী হয়ত কিছু অর্থ উপার্জন করেছে; কিন্তু এর ফলে পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেভ তার সুবিখ্যাত 'প্রস্ট্রয়কা' গ্রন্থে বলেছেন, মেয়েদের আমরা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এসেছি; তাতে উৎপাদন হয়ত কিছু বেড়েছে। কিন্তু এত বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে, যা রোধ করার কোন উপায় নেই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে উপায় বের করতে হবে, কিভাবে নারীকে ঘরে আনা যায়। (ইসলাহী খুতুবাত; মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ১/১৪৪)

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(৩৩ পৃষ্ঠার পর; লা-ওয়ারিশ মানবতা)

এই বিশ্বদরবারে মেরুদণ্ডহীন আমরা আমাদের ভাইদের সাথেই প্রতারণা করছি। আমরা তাদের জন্য আসা টন-কে-টন ত্রাণ আত্মসাৎ করছি।

মৃত্যু ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। কারণ, আমরা এতোটাই অপদার্থ যে, স্বজাতির কিছু হলে আমাদের সেই অমুসলিম শক্তির করুণার দিকেই চেয়ে থাকতে হয়। অতঃপর তারা কার্যকর ভূমিকা না রাখতে পারলে জাতিসংঘকে গালিগালাজ করে নিজেদের দায় এড়াতে হয়। আমরা কিছুই করতে পারি না। কারণ আমাদের সাহস বহুপুরুষ পূর্বেই খতম হয়ে গেছে। সেই সাহসহীন আমাদেরই কেউ কেউ নাকি মুহাজির ভাইদের শরণার্থী না বলে অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিচ্ছি। উল্লেখ্য, শরণার্থী শব্দে অধিকার ও ভালোবাসা লুকিয়ে আছে, অনুপ্রবেশকারীতে লুকিয়ে আছে বঞ্চনা ও করুণা। লজ্জা করা উচিত আমাদের...!

বিনাশ ডাকছে আমাদের। কারণ আমরা ত্রাণ দিতে গিয়ে সেলফি তুলছি। লাইভ ভিডিওতে এসে আত্মপ্রচারণায় লিপ্ত হচ্ছি। ফেসবুক ইউটিউবের সস্তাখ্যাতি দরকার? লাইক-কমেন্টের নেশা জেগেছে? বসিলা ব্রীজের সেই স্পা করা কিশোরদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পুণ্যের কাজে এসব করা ন্যাকামি। আমি নিশ্চিত এরা ঐ দলেরই লোক, যারা মক্কা মদিনায় যায়ই সেলফি তোলার জন্য।

যারা নিয়মিত পত্রিকা পড়েন তারা জেনে থাকবেন, শরণার্থী শিবিরে সবাই দরিদ্র নয়। এমন বহু রোহিঙ্গা শরণার্থী আছেন, যারা অঢেল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আছেন অনেক অনেক আলেম-উলামাও। দুর্ভাগ্যবশত আজ সবার একটাই পরিচয়- রোহিঙ্গা শরণার্থী। নির্বিশেষে সবারই সম্বল একখণ্ড মাটি আর একটি সস্তা ত্রিপল। ত্রাণের জন্য সবাই লাইনে দাঁড়াচ্ছে শরণার্থী পরিচয়ে। আলেম বা শিল্পপতি পরিচয়ের আলাদা কদর তারা হয় তো ভুলতে বসেছে। তাই বলে কি আমরাও মর্যাদার স্তরভেদ না বুঝে যার তার মুখে খিচুরির পোটলা ধরে সেলফি তুলে তাদের মানহানি করবো?

তাহলে শুনুন! আমাদেরও বিপদ ঘনিয়ে আসছে! কারণ আমরা এখনো ভোগমত্ত বিলাসী ও আড্ডামুখর জীবনে ডুবে আছি। অথচ অমন আড্ডা-হাসি ক'দিন আগেও নাফ নদের ওপারে ছিলো। তাদেরও সংসার ছিলো, স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু ওসব ছেড়ে আজ তারা দলেদলে শ্বাপদসংকুল দুর্গম জঙ্গল পাড়ি দিচ্ছে। সেই কাফেলায় এমন গর্ভবতী নারীও আছে, যার আজ পূর্ণ বিশ্রামে থাকার কথা ছিলো। কিন্তু মৃত্যু এতোই ভয়ানক, যাকে ধাওয়া করে সে বুঝে। তাই গর্ভের ব্যথা সয়েই একটু বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে এই ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু করেছে এবং অসংখ্য কাঁটাগুল্ম, চড়াই-উৎরাই ও এবড়োথেবড়ো মাটিতে দিনের পর দিন চলার ধকল সইতে না পেরে যাত্রাপথেই তার প্রসব হয়ে গেছে। এই শিশু কি একদিন বড় হবে? যদি হয়, সে কি আদৌ জানতে পারবে তাকে পেটে নিয়ে তার মায়ের সংগ্রামের কথা এবং কী বিভীষিকার মধ্য দিয়ে তার জন্ম হয়েছিলো?

তারপর সেই মা যখন দশটি দিন-রাত অবিরাম ছুটতে থেকে কোলের এখনো রক্তমাখা ফুটফুটে বাচ্চাটি নিয়ে নাফ নদের তীরে উপনীত হলো, তখন নাফ নদের মাঝি তার সাথে কুকুরের মতো আচরণ করলো। যেমন একটি পথহারা অথবা নির্বাসিত কুকুর অন্য কোথাও আশ্রয় চাইলে সেখানের স্থানীয় কুকুররা চরম অহম ও দাপটে খেকিয়ে ওঠে। এটাই ছিলো আমাদের সবচে' বড় স্খলন। এখন বিপদ ঠেকাবো কী করে? আমার মনে হয়, একটি উসিলায় আমরা এখনো বেঁচে আছি। সেটা হলো এতসব অনৈতিকতার মাঝেও উলামায়ে কেরামের এখলাস। তাদের প্রচারবিমুখ নেতৃত্বে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ যেভাবে মুহাজিরদের খেদমতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সত্যি তা অনন্য ও গর্বের। ইতিহাসের পাতায় তা অমর ও বিরল কীর্তি হয়ে রবে ইনশাআল্লাহ। তাই এখনো সময় আছে। আমরা তওবা করে সতর্ক হয়ে যাই। আমাদের সব পদক্ষেপ উলামায়ে কেরামের সাথে ও তাদের পরামর্শে করি। তাহলে ধেয়ে আসা বিপদ ফিরে যাবে আশা করা যায়।

লেখক : শিক্ষার্থী, দারুল ইফতা ২য় বর্ষ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

বেওয়ারিশ কুকুর, লা-ওয়ারিশ মানবতা!

আবূ তোরাব মা'সূম

এক.

বসিলা ব্রীজের ঠিক মাঝে। বব কাটিং ও স্পা করা উচ্ছৃংখল কিছু কিশোর উচ্ছল সমারোহে সেলফি তুলছে। এ যুগে এসব স্বাভাবিক। এসবে বিশেষ মনোসংযোগের কিছু নেই। সোশ্যাল মিডিয়াগুলো মানুষের সামনে সস্তাখ্যাতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মানুষ এখন সেলফি তোলে লাশ নিয়ে। ভিডিও সেট করে আত্মহত্যার জন্য ফাঁস দেয়। সেলফি ও ভিডিওর প্রশ্নে শিউরে ওঠার মতো অনেক ভয়াবহ কাজেই মানুষ এখন সাবলীল। ফেইসবুক-ইউটিউব হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। অথচ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ অ্যাক্টিভ ইউজারই ক্রমশ হয়ে উঠছে- অসামাজিক, ভণ্ড, বেয়াদব, লৌকিক, প্রতারক ও দুর্ধর্ষ। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করেন। আবিরমাখা কোদালকাটা মেঘ আর হিমেল প্রভঞ্জনের এই বিকেলের প্রতি নিরাবেগ কিশোরগুলোর উন্মাদনাও সেই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব। তারচে' বরং আমাদের ঔৎসুক্য নেমে যাক নদীর ঐ পুচকে-পাচকে ঢেউয়ে। সেই সাথে দোল খেয়ে যাক হৃদয়ে হৃদয়ে। কিন্তু বাতাসে মনে হলো দুঃখের আভাস। যেনো কাছেই কোথাও কোন বিপদগ্রস্তের চাপা আর্তনাদ ঈষৎ লিক হয়ে গেছে। যেনো লিক হয়ে বেরোতে থাকা হাওয়ার মতো চিকন হয়ে কোন করুণ সুর ভেসে আসছে । হ্যাঁ, সঠিক হলো আমাদের অনুমান। উন্মাদ কিশোরদের দুই পায়ের ফাঁক গলে চেয়ে আছে দুটো ছলছল চোখ। এমন মায়াভরা ভেজা চোখ এর আগে কোন মানুষেরও সরাসরি দেখিনি। কুকুরটির হাত-পা-মুখ শক্ত করে বেঁধে রেখেছে ওরা। ওদের আজ নেশা জেগেছে সস্তাখ্যাতির ও একটু বেশি লাইক কমেন্টের। তাই কুকুর হত্যায় এই নতুন কায়দা ও সৃজনশীলতার মচ্ছব, উন্মাদ ভিডিও ও সেলফির উৎসব। অসহায় কুকুরটি জানে না, কেনো ওরা তাকে মারছে। কিন্তু এই বোধ নিশ্চিত ওর জেগে উঠেছে- যে কারণেই হোক ওকে একটু পর ব্রীজ থেকে ফেলে দেয়া হবে। এটি মৃত্যুবোধ; যা প্রাণীমাত্রেরই জেগে ওঠে এবং সবাইকেই কাঁপিয়ে তোলে । তাই প্রাণভয়ে কাঁপছে কুকুরটিও। কিন্তু নড়তে পারছে না বেড়ির কারণে। ওর চোখে বাঁচার সুতীব্র আকুতি। ও পানিতে ডুবে মরতে চায় না। এই মানুষদের জন্যই তো কুকুরগুলো সারারাত জেগে পাহারা দেয়। বিনিময়ে মেলে কিছু আবর্জনা ও চেটেপুটে ফেলে দেয়া হাড্ডি। তাতেই ওরা তুষ্ট ও পূর্ণ অনুগত। এই কুকুরটিও হয়তো তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আজ সেই অকৃতজ্ঞ মানুষদেরই সস্তা খ্যাতিবিলাসের খেসারত দিতে হচ্ছে ওকে। প্রহর গুণতে হচ্ছে নির্মম বলিদানের। কতো পথচারী যাচ্ছে। দেখে দেখে সটকে পড়ছে। উন্মাদ কিশোরদের না হয় নারকীয় উল্লাসে চাপা পড়েছে মানবতা। তাই বলে কারোরই কি মানবতা জেগে উঠবে না? এই বখাটে পুচকে বাহিনীকে দমাতে দু-চারজন প্রভাবসম্পন্ন পথচারিই তো যথেষ্ট! প্রতিবাদ যদি এতো দুঃসাধ্য হয়েই দাঁড়ায়, ঐ নপুংসক মানুষ! তোদের বেঁচে থাকারই দরকার কী- এমন বকাও হয় তো আসছে না কুকুরটির। কারণ কুকুরটি কেবলই বাঁচতে চাইছে। লেজ দুলিয়ে আবারো এই অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোরই সেবা দিতে চাচ্ছে। হবে কি সে সুযোগ! চারপায়ের একটি রশি খুলে দিলেই হবে। মুখেরটা নিজেই খুলে নেবে। তারপর ওরা যেমন গাড়িতে এখানে নিয়ে এসেছে, গাড়িতে আবার নিজভূমে নিয়ে যেতে হবে না। এখানে এই ব্রীজে ছেড়ে দিলেই হবে। অন্য কোন ভূমে শরণ প্রার্থনা করে কোনমতে মাথা গোঁজার ঠাই করে নেবে। যদিও নতুন এলাকায় শরণার্থী হতে গেলে অন্যান্য কুকুররা তাকে অনেক কামড়াবে। কামড়াক! তবু তার একচিলতে মাটি কামড়ে বাঁচতেই হবে।

ভেতরটা উথলে উঠলো আমাদের। কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আমরা বাধা দেবো আঁচ করতে পেরেই ওরা কুকুরটিকে তুলে ফেলে দিলো ব্রীজ থেকে। চোখ বুজে ফেললাম। পতিত হচ্ছে হাত-পা বাঁধা কুকুরটি। সাথে হাত-পা বাঁধা এই আমিও। তারপর দু'জন একসাথে ডুবে গেলাম অনন্তের অতলদেশে। কোনদিন আমরা আর ভেসে উঠবো না। ব্রীজে যারা ভিডিও করছে এবং যেসব উৎসুক পথচারী তামাশা দেখছে তারা বুঝবে কী করে, পানির নিচে আমাদের উপর দিয়ে যা বয়ে যাচ্ছে তা কতোটা ভয়ঙ্কর? একটু একটু করে নিঃশ্বাস থেমে যাওয়ার সময়ও বাঁচার যে একটি আকুতি তা কতোটা গভীর ও প্রাণান্ত! বস্তুত দর্শকসারিটা বড়ই আনন্দের!

দুই.

আরাকান। অসহায় ভাগ্যবঞ্চিত কিছু মুসলমানের প্রাণের ভূমি। আঁকড়ে বেঁচে থাকার বহু শতাব্দী পুরনো ক'খণ্ড সোনার মাটি। খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় একটি নিরুপদ্রব জনপদ। এই জনপদ আজ পুড়ছে। এখানে পাড়ায়-পল্লিতে বেওয়ারিশ কুকুরের মতো নিত্য মরছে হাজার হাজার মানুষ। সেই আক্রান্ত মানুষের আহাজারি, বাঁচার তীব্র আকুতি ও পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার রক্ষার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নিয়ে ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে একবছর আগে কুকুরটির সাথে যে ভাগ্যবঞ্চনার ঘটনা ঘটেছিলো সেটি আবার মনে পড়ে গেলো। প্রশ্ন হতে পারে, পৃথিবীতে এতো মজলুম মানুষ থাকতে কুকুর কেন? কারণ-

ছিঁচকে পোলাপান অনেক সময় নিরীহ বিড়াল-কুকুরকে সামান্য অপরাধে অথবা অকারণেই দুষ্টুমি করে মেরে ফেলে। কিন্তু অকারণে পশুর মতো একটি মানুষকেও মেরে ফেলা হবে এটা আমার মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পারে না। নগর উন্নয়ন কমিটি বেওয়ারিশ কুকুর বেড়ে গেলে শহরে 'কুকুরনিধন' অভিযান চালায়। অথবা গ্লোবাকৃতির বিশাল খাঁচায় কুকুরগুলোকে ভরে দূরে কোথাও ফেলে আসে। কিন্তু মানুষ কখনো বেওয়ারিশ হয় না। কোন মানুষের যদি পৃথিবীতে কিছুই না থাকে এবং তার নিকট ও দূরের সকল স্বজনই মরে যায়; তবু সে লা-ওয়ারিশ হয় না; বরং তখন নিজরাষ্ট্র অথবা পার্শ্ববর্তী দেশ হয় তার অভিভাবক। তাই কখনোই তার গণবধ সম্ভব নয়। আবার তাকে বস্তায় ভরে দূরদেশেও ফেলে আসা যায় না। তো যে মানুষের ব্যাপারে আমাদের এহেন বিশ্বাস, বাস্তব পৃথিবীতে যখন সেই মানুষের উপর দিয়েই নিধনযজ্ঞ ও

গণনির্বাসন চলছে, তখন তার শিউরে ওঠার মত বিভিষিকা ও রোমহর্ষক জঘন্যতার চিত্রায়নে আরেকটি মানুষের কলম কিভাবে সামনে এগুতে পারে!

আবু গারীব ও গুয়ান্তানামো বে' কারাগারের অনেক অবর্ণনীয় নির্যাতনের কথা শুনেছি। এ-ও শুনেছি, একটি জ্বলজ্যান্ত মানুষকে নাকি বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে মেরেই ফেলে। কিন্তু আমি তো সরাসরি দেখিনি। একটি মানুষকে সরাসরি নির্যাতন করে মারতে দেখছি এমনটি ভাবলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন মোচড়ে ওঠে!

এসব কারণে একজন নিরপরাধ মানুষের বাঁচার আকুতি অথবা আপন দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করার আহাজারি অনুভব করতে মস্তিষ্ক অবচেতনেই কুকুরের দ্বারস্থ হয়েছে। অনেকটা মেডিকেলের ঐ ছাত্রদের মতো, যারা মানবদেহের গতিবিধি বুঝতে এবং মানুষে কাঁচি চালানোর হাত পাকা করতে প্রথমে নিরীহ বিড়াল, কুকুর, ব্যাঙ ইত্যাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেড়েফুড়ে অনুশীলন করে নেয়। পার্থক্য একটাই, প্রাণী দিয়ে ওরা পরখ করে মানবদেহ। আর আমি ঐ প্রাণী দিয়েই আঁচ করতে চাইছি মানবমন। একজন আরাকানীর উপর দিয়ে নীরবে যা বয়ে যাচ্ছে, তার পরতে পরতে যেন ভেসে উঠছে ব্রীজের সেই কুকুরটির দুঃখগাঁথা। আমার ভাবনার আড়াল-আবডাল ঠেলে বারবার যেন একটি চাপা আর্তনাদই লিক হয়ে আসছে যে, আমি মানুষ, আমি পশু নই। আমাকে আমার প্রাণের বাস্তুভিটা থেকে তাড়িয়ে দিও না। পরম ভালোবাসায় সাজানো আমাদের ঘর-সংসার পুড়িয়ে বা গুড়িয়ে দিও না। এই নিরস্ত্র আমাদেরকে পশুর মত অমন নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলো না। আমরা তোমাদের জন্য যেমন খেটেছি, তপ্ত রোদে পুড়েছি, এখনো সেই আগের মতোই দিনভর রোদে পুড়বো, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে হালচাষ করবো। তারপর যখন হেমন্তের বাতাসে সোনালী ফসল দুলতে ও নাচতে থাকবে, সেই ফসল আমাদরে গোলায় না ভরে তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তবু এক চিলতে বাঁচতে দাও...! নাহ্ আর পারছি না, স্থবির হয়ে যাচ্ছি! যেন বরফের মত জমে যাচ্ছি!

বড় অবাক লাগে, ছিঁচকে-পুচকে নাকবোঁচা বর্বর বৌদ্ধদের কাছে আজ বিড়াল-কুকুর সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হলো তাদের কাছে মশার চেয়েও উটকো, তুচ্ছ। আসলে ওদের 'অহিংসা পরম ধর্ম' ও 'জীব হত্যা মহাপাপ'– এসব বাণী আজ রক্তের বন্যায় মাখামাখি করে পিশাচ হয়ে পুনরায় ওদের উপর ভর করেছে। তাই ওরা সব্জি ছেড়ে মানুষের কলিজা চিবুচ্ছে। হিংস্র হায়েনার মতো মানুষের রক্ত চুষছে। আর বিশ্বমোড়লরা আছে দর্শকসারিতে। কেউ ভিআইপি বক্সের এসিতে বসে, কেউ মুক্তো বাতাসের সাধারণ গ্যালারিতে বসে একতরফা মৃত্যু-মৃত্যু খেলা দেখছে। যাদের পৃথিবীটা আলোকিত, যাদের জনপদ মধ্যরাতে অঘোর ঘুমে মুহুর্মুহু বোমার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে না, যাদের ঘরবাড়ি শিখা চিরন্তনের খড়ি হয়ে অবিরাম জ্বলতে থাকে না, মৃত্যুর অজগর হা করে যাদের এখনো ধাওয়া করছে না, বরং যারা বসিলা ব্রীজের উৎসুক পথচারীদের মতো ক্ষণিকের পার্থিব তামাশা উপভোগ করছে –ভোগমত্ত সেই খনিজলোভীরা বুঝবে কিভাবে, একটি বঞ্চিত মানুষের মাতৃভূমির টান ও বেঁচে থাকার আকুতি কতোটা প্রাণান্ত! একটি অবোধ কুকুরের বাঁচার আকুতি যদি হয় এতোটা মর্মস্পর্শী, এতোটা প্রাণপণ, তাহলে আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ কতোটা আকুল হতে পারে বাঁচার জন্য– তা অনেকটা ওদের মতোই দর্শকসারিতে বসে থাকা আরব ও এই আমাদের মতো গ্যালারীবিহীন গরীব স্বজাতি মুসলমানরাই তো পরিমাপ করতে অক্ষম! তাহলে ওরা কিভাবে পরিমাপ করবে? ওরা তো মুসলমানদের নেড়িকুত্তাও ভাবে না!?

কারো কি এমন মনে হচ্ছে, ইশ! শক্তিধর পার্শ্ববর্তী চীন একটু হস্তক্ষেপ করলে নিমিষেই তো সব সঙ্কট মিটে যায় এবং বসিলা ব্রীজের সেই পুচকে কিশোরদের মতো ছিঁচকে ও পুচকে মগরা এমন অবাধ দুঃসাহস দেখাতে পারে না নিরন্তর? চীন কেন হস্তক্ষেপ করতে যাবে রে বোকা! ওরা নিজেরাই তো উইঘুর মুসলিমদের কচুকাটা করছে। তাছাড়া আরাকানী মুসলিমদের দিয়ে তাদের কী লাভ! তাদের দরকার খনিজ সম্পদ।

এদিকে খনিজে চীন একা ভাগ বসাবে কেনো, আমরাও তো কিছু উচ্ছিষ্ট পেতে পারি– এই নীতিতে আমাদের একাত্তরের বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নও বাহবা জানিয়েছে মগ সেনাদের, মগসেনাদের এই নিধন অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনে অতীব প্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেছে। আর এটা করবেই না কেন তারা। চীনের মতো তারাও তো এই নিধনের পথপ্রদর্শক! জনৈক কলামিস্ট সুন্দর লিখেছেন- 'রোহিঙ্গাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণে অবশ্য রাশিয়ার আরও একটা কারণ আছে। রাশিয়াকে নিজ দেশেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির বিদ্রোহ (বিদ্রোহ পত্রিকার ভাষা। এখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলাটা যুক্তিসংগত) সামাল দিতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা ও রুশ চেচেনদের অবস্থা খুব একটা ভিন্ন নয়। মস্কো ট্যাংকের নিচে চেচেনদের পিষে মেরে ফেলে চেচনিয়ায় 'কবরের শান্তি' প্রতিষ্ঠা করেছে। বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এই শিক্ষা নিয়েই হয়তো মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এখন রোহিঙ্গা নির্মূলে উঠেপড়ে লেগেছে।'

অনেকে কিছুটা শান্তি অনুভব করছেন এই ভেবে যে, ইউরোপিয়ান দেশগুলো আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আসলে এরা কেউই পাশে দাঁড়ায় না। আর জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা পরিষদ মুসলমানদের প্রশ্নে কেবলই একটি উপহাস। কারণ ঐ যে বললাম, ওদের কাছে আমাদের জীবন নেড়িকুত্তারও মূল্য রাখে না। আজ এক ইস্যুতে পাশে দাঁড়ানোর ভাব দেখাবে, তো আরেক সময় নিধন চালিয়ে পুষিয়ে নেবে। আফগানিস্তানের সাথে আমেরিকার ব্যাপারটি নিশ্চয়ই সবার মনে আছে! তারপর রাশিয়া যে যুক্তিতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলো, সেটা কি আরাকানে নেই?

আমাদেরকেই আমাদের পাশে দাঁড়াতে হবে রে অভাগা! কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, একটি মুসলিম দেশেরও সেই ক্ষমতা নেই। কারণ কেন্দ্রীয় শক্তিহীন শতধা বিভক্ত আমরা হয় তাবেদার নয় তো গাদ্দার। তাই পরিণতি হলো, একে একে সবার মরে যাওয়া; যেমন সেদিন কুকুরকে বাঁচাতে না পেরে কুকুরের সাথে আমিও মরেছিলাম। যদিও সে মৃত্যুটা ছিলো মনুষ্যত্বের; কিন্তু এখানে হবে বাস্তবিক নির্মম মৃত্যু।

তিন.

হ্যাঁ, নির্মম মৃত্যু প্রহর গুণছে আমাদের। কারণ, আমরা ভালো করেই জানি এবং প্রতিপক্ষও নিশ্চিত করে জানে, অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি ধমকি দেয়ার মতো সামান্য শক্তিটুকুনও আমাদের নেই। তাই ওরা ভাঁজহীন কপালেই আমাদের আকাশ সীমায় চক্কর দিচ্ছে। আমরা যা পারতাম, তা হলো পরিপূর্ণ মানবতা ও নৈতিকতার প্রদর্শন। কিন্তু সেখানেও আমরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছি।

(৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বি প্রাক্টিক্যাল, ম্যান!

উসামা যুলকিফিল

হুজুগে বাঙ্গালী অভিধা আমাদের জন্য বেশ পুরনো। আমাদের হাতে-মুখে কিছু একটা তুলে দিলেই হল। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিছুদিন চারপাশ সরগরম রাখি। তারপর আবার পূর্ববৎ ঝিমিয়ে পড়ি। এই অধমও তার বাইরে নয়। অথচ একটু প্রাক্টিক্যাল হলে, চোখ-কান খোলা রাখলে কিংবা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে অনেক কিছুরই স্বরূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠার কথা। তাই কোন ঘটনা শুনেই তড়িৎ কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছে পারিপার্শ্বিকতা, সাধারণ জ্ঞান, কন্টেন্টের সম্ভাব্যতা ও উপস্থাপনভঙ্গি, অতীত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞজনের মন্তব্য ইত্যাদি আমাদের বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

দু'হাজার চার সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রলয়ঙ্কারী সুনামী হয়েছিল। সেই সুনামীর ভিডিও তখন প্রায় সবার মুঠোফোনে পাওয়া যাচ্ছে। পরিচিত একজন খুব আগ্রহ করে আমাকে সেই ভিডিও দেখাল। দেখলাম, কোত্থেকে এক বিশাল আগুনের গোলা এসে সমুদ্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়তেই পুরো সমুদ্র ভয়ানকভাবে ফুঁসে উঠল। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে যেতে লাগল। একপর্যায়ে দেখা গেল, সাগর তলে বিভিন্ন জিনিসের ধ্বংসাবশেষ ভেসে বেড়াচ্ছে। সে সবের মধ্যে আইফেল টাওয়ার আর স্ট্যাচু অব লিবার্টির টুকরো অংশও রয়েছে!! হা কপাল! ফ্রান্সে আবার কবে সুনামী হলো! আমেরিকাতেই বা ওসব কবে ঘটলো! ভিডিওটাতে খটকা লাগার মতন আরও কিছু ছিল। সম্ভবত ওটা কোন সিনেমার অংশ; কিন্তু সবাই দেখছে সুনামী ভেবে। এরপর এরকম আরও কিছু ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি।

আমরা যা শুনি, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই তা বর্ণনা করার ট্যান্ডেন্সি আমাদের আছে। কিছু ভুয়া খবর শুনে অবশ্য সত্য-মিথ্যা যাচাই করাটা মুশকিল। আবার কিছু খবরের উপস্থাপনা ও কন্টেন্ট-ই এতটা স্থুল, সেটা যে ভুয়া বুঝতে সচেতন পাঠক/দর্শকের কষ্ট করতে হয় না। সেদিন এক সহপাঠী আমাদের এক মন্ত্রী সম্পর্কে তথ্য দিলেন। সরকার নাকি তার নিরাপত্তার পেছনে বাজেটের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করে! সহপাঠীর যদি বাজেটের আকার সম্পর্কে জানা থাকতো, তবে এ তথ্য পেয়ে তিনি নিজেও হয়তো কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকতেন। চলতি বছরের বাজেটের আকার তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তাহলে এক-চতুর্থাংশ হলে কত হয়?! প্রথমত তথ্যটা সঠিক কি না, দ্বিতীয়ত সত্য হলেও শত শত কোটি টাকা ব্যয় করার কথাটা যে পুরোপুরি ভুল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

মাস কয়েক আগে অন্তর্জালে বাবরী মসজিদ এবং রাম-মন্দির নিয়ে ভোটাভুটি শুরু হয়েছিল। সবাই একে অপরকে ভোট দেয়ার আহবান জানাতে লাগল। লিংক শেয়ার করতে শুরু করল। বাবরী মসজিদকে জেতাতেই হবে। খুব কম লোকই ভাবল, কারা এই আয়োজন করেছে? এর উদ্দেশ্য বা পরিণতিই বা কি? ভোটের ফলাফল কি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন প্রভাব ফেলবে? ক'দিন পরই এই অনলাইন ভোটাভুটি নিয়ে ভারতের দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস শিরোনাম করল, Fake UP govt website conducts poll on Ram Mandir-Babri Masjid dispute, সেখানে তারা জানাল, কে বা কারা ইউপি সরকারের ওয়েবসাইট হুবহু নকল করে এই ভোট চালু করেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরে এই ফেইক ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়া হয়। কেউ বলতে পারেন, কোন তাৎপর্য না থাক, দিলে কী ক্ষতি? বাবরী মসজিদ তো এগিয়ে থাকল! না বাহে, ধান্ধাবাজেরা হুজুগ তুলে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ওয়েবসাইটের হিট বাড়িয়ে কিছু টু-পাইস কামিয়ে নেয়া। আর তারা তা স্বচ্ছন্দে করতেও পেরেছে।

এপ্রিল ফুলের ইতিহাস আমরা বছরের পর বছর জেনে আসছি, ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে একটি মসজিদে জড়ো করা হয়। তারপর সে মসজিদে আগুন লাগিয়ে সবাইকে হত্যা করা হয়। তখন নাকি রানী ইসাবেলা বলেছিলেন, Oh muslim! how fool you are! (হায় মুসলমান! তোমরা কী বোকা!) সেদিন ছিল এপ্রিলের এক তারিখ। আর তখন থেকেই এপ্রিল ফুলের শুরু। এ বর্ণনাটা মূলত সঠিক নয়। (তবে এর প্রকৃত ইতিহাস কী, তা শ্রদ্ধেয় সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর বেশ কয়েক বছর আগে মাসিক রহমতে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি কিছু ইতিহাসগ্রন্থ ও তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, এই ঘটনা সঠিক নয়। আগ্রহী পাঠক গুগলে সার্চ দিয়ে ওখান থেকে পড়ে নিতে পারেন। উইকিপিডিয়াও দেখতে পারেন।) এপ্রিল ফুলের এ ইতিহাস সম্ভবত আমাদের দেশেই চর্চা হয়। কারণ আপনি যদি মুফতী শফী রহ. এর 'জাওয়াহিরুল ফিক্হ' দেখেন তাহলে দেখবেন, তিনি 'এপ্রিল ফুল এবং এর সূচনা' শিরোনামে এই ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও উল্লেখ করেননি। তিনি এপ্রিল ফুলের ব্যাপারে তার উস্তাদ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর কথা এনেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপে এপ্রিল ফুল নিছক বিনোদনই নয় বরং এটা খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় প্রথা...।

আমি তখন কিতাব বিভাগের শুরুর দিকে পড়ি। মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের 'যিক্র ও ফিক্র' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' বইটির সূচিতে এপ্রিল ফুল শিরোনাম দেখে দ্রুত তা বের করলাম। কারণ ইতোপূর্বে তার 'জাহানে দীদাহ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পড়েছি। সেখানে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, ব্যক্তি ও ঘটনা নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে গেছেন। তাই এপ্রিল ফুলের ইতিহাস তিনি কী লিখেছেন তা জানবার ইচ্ছে। দেখা গেল, সেখানেও তিনি এ প্রচলিত ঘটনার কিচ্ছুটি মাত্র আনেননি। বরং তিনি এর উৎস খুঁজতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র আশ্রয় নিয়েছেন। মনে পড়ে, আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম।

স্পেনে খ্রিস্টানদের হাতে মুসলমান নির্যাতনের ঘটনা অবাস্তব কিছু নয়। ইনক্যুইজিশনের নামে ভয়াবহ নির্যাতন, মুসলমানদের বিপুল জ্ঞান-সম্ভার ভস্মীভূত করা, দলে দলে মুসলমানদের দেশত্যাগ এবং অবশিষ্ট হতভাগ্য মুসলমানদের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে ধর্ম বদল! যারা মরিস্কো নামে অভিহিত হতেন– বেদনার সেই উপাখ্যান এই প্রচলিত ইতিহাসের চেয়ে বহুগুণে ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক। আর এপ্রিল ফুল বর্জনের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এটা খ্রিস্টানদের কালচার। এর জন্য ভিন্ন কোন গল্পের প্রয়োজন নেই।

মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম বলেন, 'মুহিউস সুন্নাহ আবরারুল হক রহ.এর মজলিসে তাহকীক ছাড়া, যাচাই-বাছাই ছাড়া কোন কথা বলা যেত না।' উপরন্তু তাহকীক ছাড়া কথা বললে আর তা অবাস্তব হলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সেটা মিথ্যা কথাই হয়।

এটা নিশ্চিত যে, সত্যটা জানা থাকলে আমরা কখনোই হুজুগে মাতব না। কিন্তু একটু বাস্তববাদী হলেই যখন আমরা ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারি, তখন বাস্তববাদী হতে সমস্যা কোথায়! বি প্রাক্টিক্যাল, ম্যান!

লেখক : শিক্ষার্থী, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বৃদ্ধাশ্রমে কেন বাবা-মায়ের আশ্রয়

মুফতী আহসান শরিফ

বুড়ো বাবার সঙ্গে বাড়ির আঙ্গিনায় বসেছে সিফাত। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় এখানে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন দু'জনে। সেই ছোট্ট সিফাত বেশ বড়ো হয়েছে। বয়স সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ। বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছে। সামনে সুন্দর গাছ। বাতাসে হেলছে গাছের ডাল। একটা কাক ডালে বসে দু'জনের মনোযোগ কাড়ে। কাক দেখিয়ে বাবা সিফাতের কাছে জানতে চাইলেন, এটা কী? উত্তরে সিফাত বলল, বাবা! এটা 'কাক'। বাবা আবার জিজ্ঞেস করলে, সিফাত উত্তর দেয়। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গে ছেলে বলে, 'কাক'! কিছুক্ষণ পর আবার জানতে চাইলে চিৎকার দিয়ে ছেলে বলে, এটা কাউয়া! বাবা, এটা কাউয়া! এরপর আবার জানতে চাইলে ছেলে রেগে ওঠে বলে, 'তুমি সব সময় এককথা হাজার বার জানতে চাও! কতবার বললাম, এটা কাউয়া! এটা কাউয়া!! এটা কাউয়া!!! এরপর ঘর থেকে ডাইরি বের করে বাবা সিফাতকে পড়তে বললে, সিফাত পড়ে– আমার ছোট ছেলে সিফাতের সঙ্গে বারান্দায় বসেছিলাম। একটা কাক দেখে ও পঁচিশবার জানতে চাইল। আমি পঁচিশবার উত্তর দিলাম। ও খুশি হল। ওর জন্য আমার মায়াও বাড়ল।

ঊনসত্তর বছরের বুড়ো সামিউল হক (ছদ্মনাম) ছিলেন একজন কলামিস্ট। বাড়ি যশোর। চাকুরি করতেন চারুকলায়। ষোল বছর আগে স্ত্রী মারা গেছে। সংসারে এক ছেলে এক মেয়ে। চাকুরির টাকা দিয়ে উত্তরায় করা বাড়িটি রেখেছেন প্রিয় সন্তানের নামে। ছেলে ব্যাংকার। মেয়ে থাকে আমেরিকা।

নয় বছর আগে তার চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এ নয় বছর তিনি বৃদ্ধাশ্রমে। ছেলের বউ এবং পুত্র-সন্তান আছে। মেয়েরও আছে স্বামীর সংসার। তারা বেশ সুখে আছে। নিজস্ব বাড়ি থাকার পরও বৃদ্ধাশ্রমে থাকার কারণ জানতে চাইলে সামিউলের ভেতরে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস বেরোয় তার ভেতর থেকে। কোন কারণ বলতে নারাজ তিনি। বললেন, 'এখানে নিরিবিলি পরিবেশ। নিরিবিলি থাকতে ভালো লাগে।' চাপাচাপি করলেও বললেন না তিনি। রেগে উঠে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন– 'বললে হবে কী! আপনি কি সমাধা করতে পারবেন? শেখ হাসিনা পারবে? খালেদা জিয়া পারবে? কেউ পারবে না।' বাসায় যাওয়া হয়? নম্রভাবে জানতে চাইলে বললেন, 'না, কোথাও যাই না।' ছেলে-মেয়েরা আপনার কাছে আসে? উত্তরে বললেন, 'ওরা পয়লা বৈশাখে এসে কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। সারা বছর আর আসে না।' বৃদ্ধাশ্রমের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা জানতে চাইলে বলেন, 'এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ভালো না। আমাদের বিনোদনের কোন সামগ্রী এখানে নেই। নেই বড়ো কোন ডাক্তার বা চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা। ভাড়া বেশি; চিকিৎসা সেবা নেই। কর্মচারীদের ব্যবহার খারাপ। বৃদ্ধভাতা দেয়া হয় না। আরো কতো শত যন্ত্রণা!'

উওয়াইস করনী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ঈমান এনেছিলেন। ইয়ামান ছিলেন বলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়নি। এটি ছিল তার জীবনের সবচে' বড় প্রত্যাশা। এতে তিনি সাহাবী হতে পারতেন (দুনিয়ার হাজার ওলি মিলেও একজন সাধারণ সাহাবীর ঘোড়ার পায়ের নিচের বালির সমপরিমাণ মর্যাদার অধিকারী নয়)। একবার তিনি লোক মারফত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আর্জি পেশ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা অসুস্থ, আমি চাচ্ছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, আসব?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার কাছে না এসে তুমি তোমার মায়ের সেবা করো।' উওয়াইস করনী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলেন না। মায়ের সেবা করলেন। পরে হযরত উমর রাযি. কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়্যত করে গেলেন– ইয়ামানে উওয়াইস করনী নামে একজন লোক আছেন। তাকে পেলে দু'আ চেয়ে নিয়ো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর উওয়াইস করনীকে খুঁজতে লাগলেন হযরত উমর রাযি.। অনেক দিন পর তাকে পেয়ে দু'আ করালেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৪২)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজ দেশ ত্যাগ করে আপনার সঙ্গে হিজরত এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের বাইয়াত নিতে এসেছি। আমি আশা করছি এতে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব এবং উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবা-মায়ের কেউ কি জীবিত আছেন?' সাহাবী বললেন, 'জ্বী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা-মা দু'জনই জীবিত আছেন।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি কি প্রকৃত সওয়াবের আশা কর?' সাহাবী বললেন, 'জ্বী, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে হিজরত এবং জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তোমার বাবা-মায়ের কাছে যাও। তাদের সেবা করো। তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। (মুসনাদে আহমদ)

উপরে সামাজিক চিত্র এবং হাদীস দু'টি আমরা পড়লাম। আমরা মানুষ এবং মুসলমান হিসেবে বিষয়টি বোধগম্য হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা ক'জন বাবা-মায়ের সেবা করি? তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করি? আদৌ করি কী? কেন করি না? '...তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের সঙ্গে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো। (সূরা বনী ইসরাঈল- ২৩)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতসহ বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাবা-মায়ের সেবা করতে বলেছেন। তাদের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। বলেছেন তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে জিহাদ থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বাবা-মায়ের খেদমত করাকে। তিনি অভিশাপ দিয়েছেন তাদেরকে, যারা বুড়ো বাবা-মায়ের দু'জন বা কোন একজনকে পেল, অথচ তাদের সেবা করে গুনাহ মাফ করাতে পারল না।

কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমই কি বুড়ো বাবা-মায়ের জন্য আরামদায়ক? কেন এ বৃদ্ধাশ্রম? বছরে একদিন সাক্ষাৎ করা, এটাই কি বাবা-মায়ের সঙ্গে সুন্দর আচরণ? এতেই কি তাদের হক আদায় হয়ে যাচ্ছে? যে বাবা-মা পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখিয়েছেন। নিজে না খেয়ে খাইয়েছেন। কোলে-কাঁধে নিয়ে বড় করেছেন। নিঃসঙ্কোচে মল-মূত্র পরিষ্কার করেছেন। কিছুই কি তাদের পাওয়ার নেই? তাদের সঙ্গে কেন এই অনিয়ম, অবিচার? আমরা তো মৃত্যু থেকে বাঁচতে চেষ্টা করলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চেষ্টা করি না, অথচ চেষ্টা করলে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে; কিন্তু মৃত্যু থেকে?!

লেখক : প্রিন্সিপাল, মাদরাসাতুল বালাগ, ঝাউচর বাজার, পশ্চিম হাজারিবাগ, ঢাকা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আবূ খালেদ
মাগুরা

২৪০ প্রশ্ন : (ক) কোন ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার জন্য কিছু টাকা ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক লোন নিলো। এভাবে লোন নিয়ে হজ্জে যাওয়া জায়েয আছে কি? এ অবস্থায় কেউ হজ্জ করলে তার বিধান কি?

(খ) কোন মহিলার স্বামী আরাফার ময়দানে ইন্তিকাল করলে স্ত্রী হজের বাকী আমল পুরা করবে, নাকি দেশে ফিরে আসবে?

উল্লেখ্য, মহিলার সাথে তার স্বামী ছাড়া আর কোন মাহরাম নেই।

(ক) ইসলামে সুদ জঘন্যতম একটি অন্যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ দাতা, গ্রহীতা, সাক্ষী ও সুদী কারবারের লেখকের প্রতি লা'নত করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮৪৪) সুতরাং ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক লোন নিয়ে হজ্জ করা জায়িয নয়। অতএব এভাবে হজ্জ করবে না। এতদসত্ত্বেও কেউ এভাবে হজ্জ করলে তার হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে। (সূরা বাকারা- ২৭৫, ফাতাওয়া শামী ৫/১৬৮, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩/২৬৩)

(খ) প্রশ্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী মহিলা আরাফার ময়দানে অবস্থান করবে এবং হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাদি পুরো করে ফিরে আসবে। (বাদায়িউস সানায়ি' ৩/৫৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫৬০, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৭/৩৮, ইমদাদুল হুজ্জাজ ১/৬৭, আনওয়ারুল মানাসিক; পৃষ্ঠা ১৮৩)

মাওলানা রফীকুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৪১ প্রশ্ন : আমি একজন ছাত্র। আমার পিতা আমার খরচ বহন করেন । আমরা বর্তমানে ভাড়া বাসায় থাকি। তবে আমাদের নিজেদের বাড়ি ও দোকান রয়েছে। সেখান থেকে বাসা ও দোকান ভাড়া পাই। এ দিয়ে আমাদের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই চলে। আমার পিতা আমার নামে ১ কাঠা জমি রেজিস্ট্রেশন করেছেন; যার মূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি। কিন্তু ঐ জমির উপর আমার কোন সত্ত্বাধিকার নেই এবং এই জমি বিক্রি করার ক্ষমতাও রাখি না। আবার ঐ জমিটা আমার বাবা বিক্রি করে আরেকটা জমি ক্রয় করবেন বলেছেন।

এখন আমার জানার বিষয় হল, উক্ত জমির কারণে আমার উপর হজ্জ ফরয কিনা? যদি ফরয হয়ে থাকে তাহলে কি জমি বিক্রি করে হজ্জ করতে হবে? ফরয হলে সেক্ষেত্রে আমার বাবা যদি হজ্জের সফরখরচ বহন করেন তাহলে আমার হজ্জ আদায় হবে কি? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : না, আপনার উপর হজ্জ ফরয হয়নি। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য অন্যতম একটি শর্ত হল, হজ্জের সফরের খরচের জন্য এই পরিমাণ নগদ টাকা বা অন্য কোন সম্পদের মালিক হওয়া যার দ্বারা হজ্জ আদায় করা যায়। আর আপনার বর্ণনামতে আপনি যেহেতু সেই পরিমাণ সম্পদের মালিক নন (কেননা শুধু রেজিস্ট্রেশন দ্বারাই সম্পদের মালিক হয় না; বরং সত্ত্বাধিকারী হতে হয়), তাই আপনার উপর হজ্জ ফরয নয়। তারপরও যদি আপনার বাবা হজ্জের খরচ বহন করেন আর আপনিও ফরয আদায় করার নিয়তে হজ্জ পালন করেন, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী হলেও পৃথকভাবে আরেকবার হজ্জ করতে হবে না। (সূরা আলে ইমরান- ৯৭, ফাতাওয়া শামী ২/৪৬১, ৪৬২, আল-মুহীতুল বুরহানী ৩/৮, তুহফাতুল ফুকাহা ১/৩৮৪, ৩৮৬, বাদায়িউস সানায়ি' ২/১২০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৫৩৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১/৩৫০)

উম্মে মুহসিন
মিরপুর, ঢাকা

২৪২ প্রশ্ন : (ক) আমার এক বোনের ৬ ভরি স্বর্ণ আছে। ব্যাংক একাউন্ট বা অন্য কোন সঞ্চয়ের সূরতে কোন প্রকার টাকা জমা নেই। তার সকল প্রয়োজনীয় জিনিস তার স্বামী ক্রয় করে দেন। হাতখরচ হিসেবে অল্প কিছু টাকা হয়তো তার ব্যাগে থাকে। তার কোন ব্যবসায়ী পণ্য বা রূপার অলঙ্কার নেই। এ অবস্থায় কি তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে গেছে? এ সূরতে 'তার উপর যাকাত ফরয হয় না' এ রকম কোন ফিকহী মত বা বিকল্প মাসআলা রয়েছে কি?

(খ) বর্ণিত সূরতে তার জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব হয়েছে কি?

উত্তর : (ক) বছর পূর্ণ হওয়ার দিন যদি তার নিকট নগদ টাকা না থাকে তাহলে তার জন্য যাকাত আদায় করা ফরয নয়। তবে যদি তার নিকট বছরের শুরুতে ও শেষে ৬ ভরি স্বর্ণ ছাড়াও রৌপ্য বা নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল সামান্য পরিমাণও সঞ্চিত থাকে তাহলে উক্ত সম্পদের মোট মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। (মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৭১, ফাতাওয়া শামী ২/২৯৫, ২৯৯, আল-হিদায়া ১/১০৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৫৫)

(খ) প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যদি তার নিকট যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ৬ ভরি স্বর্ণের সাথে সামান্য কিছু নগদ টাকা কিংবা নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কোন সম্পদ থাকে তাহলে তার জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। (আল-হিদায়া ৪/৩৫৫, ফাতাওয়া শামী ২/২৮৬, বাদায়িউস সানায়ি' ৫/৬৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২২৯)

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবুল বাশার
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৪৩ প্রশ্ন : (ক) গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হজের সময় ১১ ও ১২ যিলহজ্জ 'রমী' তথা জামারায় পাথর নিক্ষেপের জন্য সূর্যোদয় থেকে বিভিন্ন মুআল্লিমের হজযাত্রীদের জন্য সময় ভাগ করে দিয়েছিল। ফলে যাদের সময় সকালে ছিল তাদের অনেকেই সকালে রমী করেছে, অনেকে করেনি। এখন প্রশ্ন হল, এ দু'দিন তো যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে কঙ্কর মারা নিষেধ। তাহলে যারা সকালে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছে তাদের দম দিতে হবে কিনা? অনেকের কাছে জানা যায়, দুপুরে একসাথে আসলে ভিড়ে অনেকে মারা যায়, সে কারণে এ রকম করেছে।

(খ) বড় মসজিদে নামাযীর সামনে দুই কাতার (প্রায় ৮ ফুট) পরিমাণ জায়গা রেখে তার পশ্চিম পাশ দিয়ে যাতায়াত

করা জায়েয বলা হয়। এক্ষেত্রে বড় মসজিদ বলতে মসজিদের পূর্ব-পশ্চিম কমপক্ষে ৪০ হাত হতে হবে কিনা? মসজিদের জন্য ৪০ হাত দৈর্ঘ্য (উত্তর-দক্ষিণ) ও ১৫ হাত প্রস্থ (পূর্ব-পশ্চিম) একটা ঘর তৈরি করে তার পূর্ব দিকে আরো ৩০ হাত প্রস্থ (পূর্ব-পশ্চিম) বারান্দা তৈরি করা হল, যা মসজিদেরই অংশ। তাহলে এ মসজিদকে বড় মসজিদ বলা যাবে কিনা? এখানে ঘরের দৈর্ঘ্যের সাথে বারান্দার দৈর্ঘ্য যোগ করা যাবে কিনা? প্রকৃতপক্ষে বড় মসজিদ বলতে কোন মসজিদকে বুঝব?

উত্তর : (ক) ১১ ও ১২ যিলহজের রমী সূর্য ঢলে যাওয়ার পর করা ওয়াজিব। সুতরাং এই দুই দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে রমী করা জায়েয নেই। যারা সূর্যোদয়ের পর সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে রমী করেছে বিশুদ্ধ মতানুসারে তাদের উপর দম ওয়াজিব। সুতরাং নিজে বা কারো মাধ্যমে হারাম এলাকায় দম দিয়ে দিলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৫২১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৫৭, বাদায়িউস সানায়ি' ৩/৯৩, আল-মাবসূত ৪/৬৮, গুনইয়াতুন নাসিক ফী বুগইয়াতুল মানাসিক; পৃষ্ঠা ২৬২, আনওয়ারে মানাসিক; পৃষ্ঠা ৪৯২)

(খ) বড় মসজিদে নামাযীর সামনে ২/৩ কাতার পরিমাণ খালী জায়গা রেখে পশ্চিম পাশ দিয়ে যাতায়াত করা জায়েয আছে। আর বড় মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মসজিদ, যার পূর্ব-পশ্চিম দিক ৪০ হাত বা তার চেয়ে বেশি হয়।

প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদটি বড় মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। (ফাতাওয়া শামী ১/৬৩৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১১৫)

এ.কে.এম. আকবর খান
মোমেনশাহী

২৪৪ প্রশ্ন : (ক) আমরা জানি, কুরবানী করার পর শরীকানা কুরবানী দিলে পুরা অংশ সমানভাবে ওজন করে শরীকদের মাঝে বণ্টন করতে হয়। পরে শরীকরা নিজের অংশকে তিনভাগ করতেও পারে বা পুরোটাই নিজে রেখে দিতে পারে। তবে শরীকানা বণ্টনের পূর্বে কেউ কোন অংশ কাউকে দিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এলাকায় ধনী-গরীব, কুরবানী ওয়াজিব হোক বা না হোক সব ধরনের ব্যক্তিকে নিয়ে একসমাজ গঠনের রেওয়ায পূর্ব থেকেই চলে আসছে। তো সমাজের যারা কুরবানী করে তারা কুরবানী করার পর প্রথমে পূর্ণ অংশকে তিনভাগ করে একভাগ সমাজের নামে দিয়ে দেয়। আর সমাজের নেতৃবৃন্দ এই একভাগকে জমা করে সমাজে যতজন সদস্য আছে (এতে যারা কুরবানী করেছে তারাও আছে) ততগুলো ভাগ করে সবাইকে একভাগ করে দেয়। তবে কেউ এতে মান্নত-কুরবানীর গোশত বণ্টনের পূর্বে সমাজকে দিয়েছিল কিনা তা জানা নেই এবং জানা সম্ভব হচ্ছে না।

বি.দ্র. যারা কুরবানী করে তারা সমাজকে একভাগ দেয়ার সময় সদকা বা হেবা কোনটারই নিয়ত করে দেয় না; বরং সমাজের সবাইকে কিছু কিছু দেয়ার জন্য দেয় যেন এতে সবাই ঈদ-আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এখন জানার বিষয় হল এভাবে শরীকানা বণ্টনের পূর্বে সমাজকে একভাগ দিয়ে দেয়া জায়েয হবে কিনা?

আর যেহেতু আমিও সমাজের একজন সদস্য এবং আমার কুরবানীর অংশও সমাজকে দিয়েছিলাম। পরে সমাজ তা থেকে একভাগ আমাকেও দিয়েছে। এখন আমার জন্য তা নেয়া জায়েয হবে কিনা? যদি জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে যেহেতু আমি নিয়ে নিয়েছি এখন আমার করণীয় কি?

(খ) যার উপর কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তির মান্নত-কুরবানী করার দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে কিনা? ওয়াজিব কুরবানী কি আলাদাভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর : (ক) কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীবদেরকে দান করা মুস্তাহাব। এটা সম্পূর্ণ কুরবানী দাতার ব্যক্তিগত বিষয় যে, সে কতটুকু সদকা করবে কিংবা আদৌ করবে কিনা? এ ব্যাপারে অন্যদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। হ্যাঁ, স্বাধীনভাবে যার যতটুকু ইচ্ছা একজায়গায় একত্র করে শুধু গরীবদের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই, চাই তা শরীকদের পরস্পরে বণ্টনের পরে হোক কিংবা সকলের সম্মতিক্রমে বণ্টনের পূর্বে হোক।

শরীয়ত কাউকে সমাজে গোশত দান করতে বাধ্য করেনি; ব্যক্তিগতভাগে দান করতে বলা হয়েছে। সমাজের জন্য এক তৃতীয়াংশ কিংবা গরীব-ধনী সকলের মাঝে বণ্টনের জন্য এক তৃতীয়াংশ এ ধরনের কোন নিয়ম শরীয়তে নেই। এটা একটা গলত পন্থা যা একাধিক কারণে শরীয়ত পরিপন্থী। যেমন-

(১) এ ব্যবস্থাপনায় সকলে খুশি মনে অংশগ্রহণ করে কিনা সেটা নিশ্চিত নয়। কেউ সামাজিক নিয়মে অংশগ্রহণ করে, এমন আশঙ্কাও থাকে। সেক্ষেত্রে ধনীদের জন্য ঐ লোকের গোশতের অংশ হালাল হবে না।

(২) এমনও কেউ থাকতে পারে, যে তার দানকৃত অংশ গরীবদেরকে দিতে চায়; ধনীদেরকে নয়। প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে এর সুযোগটা নষ্ট করে দেয়া হয়।

(৩) কারো মান্নতের অংশও থাকতে পারে, যা শুধু গরীবদের মাঝেই বণ্টন করতে হয়। প্রশ্নোক্ত পদ্ধতি চালু থাকলে ঐ লোকের জন্য এখানে শরীক হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

সুতরাং এ গলত পন্থার কারণে সমাজ থেকে দানকৃত গোশত আপনার জন্য গ্রহণ করা ঠিক হয়নি। কেননা অনির্দিষ্টভাবে একতৃতীয়াংশ সমাজকে দান করায় তা গরীবদের জন্য দানযোগ্য তৃতীয়াংশ গণ্য হবে। এখন আপনার করণীয় হল, প্রাপ্ত সেই একভাগ পরিমাণ গোশতের আনুমানিক মূল্য কোন গরীবকে দান করে দেয়া। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫৬৯, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ১১৫২৬, বাদায়িউস সানায়ি' ৪/২২৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, আল-বাহরুর রায়িক ৮/৩২১-৩২৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৯১-৩৯২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৪৯)

(খ) যে ব্যক্তির উপর পূর্ব থেকেই কুরবানী করা ওয়াজিব মান্নতের কুরবানীর দ্বারা তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। ওয়াজিব কুরবানী পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ি' ৪/১৯৪-১৯৫, আল-বাহরুর রায়িক ৮/৩২১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২০, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৩২-৩৩৩)

আতাউর রহমান খান
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

২৪৫ প্রশ্ন : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা একটি বড় ইবাদত। এর জন্য কোন সীমা নির্ধারিত আছে কি? সাধারণ নিয়মে আমার চাচার মামার জেঠাশের ভাগ্নীর ছেলেও আমার আত্মীয়। তার সাথেও কি আমার আত্মীয়তা রক্ষা করতে হবে?

উত্তর : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা কিছু ক্ষেত্রে ওয়াজিব, কিছু ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। ওয়াজিব হক আদায় হবে পিতা-মাতা, তাদের ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন এবং চাচা, ফুফু, মামা, খালা ও তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার দ্বারা। চাই তারা মাহরাম হোক বা না হোক। এছাড়া বাকি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা

মুস্তাহাব। (সূরা মুহাম্মাদ- ২২-২৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৫৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৫৫, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯০৯, ফাতাওয়া শামী ৬/৪১১)

আবূ আব্দুল্লাহ
মিরপুর, ঢাকা

২৪৬ প্রশ্ন : হাদীসে পাকের মর্মার্থ হল, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নক্ষত্রের মত। প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রশ্ন হল, জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্‌ফীনে আমাদের জন্য কী শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন সময় ঝগড়া বা ইখতিলাফ হলে অনেক মুরুব্বী বলেন, এর সমাধান সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে গ্রহণ করেন।

উত্তর : হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তরবিয়াতপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উম্মতের জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইবাদত-বন্দেগী এবং অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেলে তওবার ক্ষেত্রেও। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে পারস্পরিক আচরণবিধির ক্ষেত্রেও।

আল্লাহ তা'আলার সকল কাজই হিকমতপূর্ণ– পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয়। জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্‌ফীনের মধ্যে অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি হল, জীবন চলার পথে কোন ব্যক্তি বা জামা'আতের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তাদের ব্যাপারে নিজেদের ভাষা ও মন্তব্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং চোখ-কানসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত রাখার শিক্ষা গ্রহণ করা। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রাযি. খুতবার মধ্যে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন যে, খবরদার! প্রতিপক্ষের ব্যাপারে নিজের হাত এবং যবান নিয়ন্ত্রণে রাখো; নিজ থেকে অগ্রসর হয়ো না।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আলী রাযি. এর কাছে হযরত যুবাইর রাযি. কে শহীদ করে দেয়ার অনুমতি চাইলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, অনুমতি দাও, তবে শহীদকারীকে জাহান্নামী হওয়ার সংবাদও শুনিয়ে দিয়ো। এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে হযরত আলী রাযি. এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে চলা। যুদ্ধের প্রারম্ভে খুতবার মধ্যে তিনি ঘোষণা করলেন, মনে রেখো! বসরাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতাই মুখ্য। তারা আমাদের উপর আক্রমণ না করলে আমরাও আক্রমণ করব না। যদি তারা আক্রমণ করেই বসে তখন আমরা পাল্টা আক্রমণ করে শুধুমাত্র প্রতিহত করব।

যুদ্ধের ময়দানে উভয় পক্ষের সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। সাবায়ী চক্রের কবলে পড়ে বাধ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে হযরত আলী রাযি. ময়দানের সকল প্রান্তে ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং এই অনর্থক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের রক্তাক্ত লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন এবং অফসোস করতে থাকেন। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষের শহীদগণের জানাযা পড়ান ও তাদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৩১, আল-কামিল ফিত্-তারীখ ৩/১২৬, ১৬৯, তারীখুত তাবারী ৪/৫১০)

মুহাম্মাদ আসিফ আসলাম
কুড়িল বিশ্বরোড, ঢাকা

২৪৭ প্রশ্ন : পশুর হাটে ইজারাদার কর্তৃক ক্রেতাদের থেকে যে হাসিল উসূল করা হয় তা ইসলামে বৈধ আছে কি না? যদি বৈধ হয় সেক্ষেত্রে বর্তমানে যে অধিকহারে হাসিল নেয়া হচ্ছে (ষাট হাজার টাকা মূল্যের গরুর হাসিল সর্বনিম্ন তিন হাজার টাকা) এটা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পশুহাটে ইজারাদার কর্তৃক ক্রেতাদের থেকে যে হাসিল উসূল করা হয় তা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। কেননা ইজারাদার যদি হাটের মধ্যে কোন সেবা দিয়েও থাকে তবে তার উপকার ভোগ করে থাকে পশু বিক্রেতাগণ। তাই তাদের উচিত ছিল বিক্রেতার কাছ থেকে হাসিল উসূল করা। কারণ বিক্রেতা ইজারাদারের যে সুবিধা ভোগ করেছে ক্রেতারা তা ভোগ করতে যায়নি। অতএব ইজারাদার কর্তৃক বিক্রেতার কাছ থেকে হাসিল উসূল করা যৌক্তিক; ক্রেতার কাছ থেকে কিছুতেই নয়। (সূরা নিসা- ২৯, ফাতাওয়া শামী ৬/৫, ফিকহুল মু'আমালাত ১/৯৪, বাদায়িউস সানায়ে ৪/১৯৫)

আবূ ফুয়াদ
শ্রীপুর, গাজীপুর

২৪৮ প্রশ্ন : টাইলসের উপর পেশাব লাগলে সেটা পবিত্র করার জন্য তিনবার পানি দ্বারা ধৌত করা জরুরী, নাকি শুধু মুছে ফেললেই পবিত্র হয়ে যাবে? যদি মোছার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায় তাহলে কয়বার মুছতে হবে? পরবর্তীতে যদি সেখানে ভেজা পা রাখে তাহলে কি পুনরায় নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর : টাইলসের উপর পেশাব লাগলে তা পবিত্রতার জন্য টাইলসের উপর তিনবার পানি ঢেলে দিয়ে প্রতিবার একটি পবিত্র কাপড়ের টুকরো দিয়ে পানি ভালোভাবে মুছে নিলেই পবিত্র হয়ে যাবে। এভাবে মোছার পরবর্তীতে ভেজা পা রাখলে তা আর পুনরায় অপবিত্র হয়ে যাবে না। (আল-বাহরুর রায়িক ১/২৩৭, ফাতাওয়া শামী ১/৩১২, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/২০০, বাদায়িউস সানায়ে ১/৮৮, ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১, কিতাবুন নাওয়াযিল ৩/৫২-৫৩)

রফিজ আহমাদ
শেখেরটেক, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৪৯ প্রশ্ন : আমি একজন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবি। প্রতিমাসে আমার বেতনের টাকা থেকে একটা অংশ সরকার ট্যাক্স বাবদ কেটে নেয়। উদাহরণস্বরূপ গত জুন মাসে প্রায় ২৯০০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা কেটে নিয়েছে। এদিকে সরকার 'সঞ্চয়পত্র' বন্ড ইত্যাদি কিনলে কিছু ট্যাক্স মওকূফ করে দেয় এবং বছর শেষে ৮% বা ৯% হারে সুদ দেয়। আমার প্রশ্ন হল-

(ক) ট্যাক্স মওকুফের জন্য সঞ্চয়পত্র বা শেয়ার মার্কেটে অল্প কিছুদিনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারব কি না?

(খ) সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদ, প্রদত্ত ট্যাক্সের বদলী হিসেবে আমি ব্যবহার করতে পারব কি না?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি, গত জুন মাসে ২৯০০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা ট্যাক্স কেটেছে। আবার উক্ত মাসে বিগত বছরের ক্রয়কৃত সঞ্চয় বিক্রি করে প্রায় ৩১০০০ (একত্রিশ হাজার) টাকা পেয়েছি। সাধারণত সারা বছর প্রায় ২ লক্ষ টাকা কেটে নেয়। আর সঞ্চয়পত্রের সুদ একবার পাওয়া যায়– ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা।

উত্তর : (ক) ইনকাম ট্যাক্স মওকুফ করা বা কিছুটা হ্রাস করার জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয় করার অবকাশ রয়েছে। তবে সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে সুদ অর্জিত হলে

সে সুদ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয নেই। বরং সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দরিদ্রদেরকে দান করে দিতে হবে অথবা কোন সওয়াবের কাজে ব্যয় করতে হবে।
উল্লেখ্য, সঞ্চয়পত্রের মধ্যে সুদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এজন্য সাধারণ অবস্থায় তা ক্রয় করা জায়েয নেই। আর বর্তমান শেয়ার কারবারে সুদ ও জুয়া উভয়টির সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই কোন অবস্থায়ই এ লেনদেনে জড়িত হওয়ার অবকাশ নেই। (সূরা আলে ইমরান- ১৩০, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৮৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২০/৪৬৬)
(খ) সঞ্চয়পত্র থেকে অর্জিত মুনাফা, অনুরূপভাবে সরকারি অন্যান্য সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত মুনাফা ইনকাম ট্যাক্স বাবদ প্রদান করা যাবে। কিংবা প্রদত্ত ট্যাক্সের সমপরিমাণ নিজে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বেসরকারি সুদী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ইনকাম ট্যাক্স বাবদ প্রদান করা যাবে না। বর্তমান শেয়ার মার্কেট কোম্পানীভিত্তিক হওয়ায় তার মুনাফা ইনকাম ট্যাক্স বাবদ প্রদান করা যাবে না। (সূরা আলে ইমরান- ১৩০, সূরা বাকারা- ২৭৫, ২৭৮, ২৭৯, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৮৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/১৭৫)

মুহাম্মাদ মুঈনুল হক
মোমেনশাহী
২৫০ প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি কুপ্রথা চালু রয়েছে। বিবাহ, আকীকা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পানাহারের পর গেটের সামনে কিছু লোক টেবিল নিয়ে বসে থাকে। উক্ত টেবিলে পানের ব্যবস্থার সাথে সাথে একটি খাতাও থাকে– যাতে মানুষের দেয়া টাকা, উপঢৌকন ইত্যাদি লিখে রাখা হয়। এক্ষেত্রে এখানে এসে মানুষ নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিক রীতি রক্ষার্থে উপহার বা টাকা-পয়সা দিতে বাধ্য হয়। আর কোন দাওয়াতী মেহমান না আসলে মনে করা হয়, উপহার দেয়ার ভয়ে আসেনি। উক্ত পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।
উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে হাদিয়া, উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নেই। সামাজিক প্রথা ও প্রথাগত আয়োজনের কারণে সেটা আর শুধু হাদিয়া হিসেবে থাকে না। বরং তা দাওয়াতী মেহমানের উপর এক ধরনের সামাজিক যুলুম ও কুপ্রথায় পরিণত হয় কিংবা বিদ'আতে পরিণত হয়। সুতরাং এভাবে উপহার গ্রহণ বর্জনীয়। কোন মেজবানের পক্ষ থেকে যদি উপহার গ্রহণের আগ্রহ না থাকে; বরং আনুষ্ঠানিক উপহারকে সে নিষেধ করে এবং মজলিসে উপহার কালেকশনের কোন ব্যবস্থাপনা করা না হয়, এতদসত্ত্বেও কেউ একান্তভাবে কিংবা অনুষ্ঠানের আগে পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করে কোন উপহার দেয়, তাহলে শরীয়তে এর অবকাশ রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে এটা হাদিয়া হিসেবে গণ্য হবে। আর হাদিয়া যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময়ে মহব্বত প্রকাশার্থে দেয়া যায়। (সূরা নিসা- ২৯, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৬৯৫, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২১৩০, আদাবুল মুফরাত লিল-বুখারী; হা.নং ৫৯৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ২/১৬৭, ফাতাওয়া শামী ৫/৬৯৬, ৬/৩৪৮, কিতাবুল ফাতাওয়া ৪/৪২২, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৩/২১৩)

মুশাররফ হুসাইন
বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৫১ প্রশ্ন : আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। আমাদের মেজ ভাই রবিউল হুসাইন আমার মা জীবিত থাকা অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুর পর আমরা জানতে পারি, আমার মা নিজ নামে থাকা দশ শতাংশ জমি মেজ ভাইকে হেবা করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু মেজ ভাই কোনভাবেই ঐ জমির ভোগ-দখলে ছিলেন না। এমতাবস্থায় আমার মা-ও মারা যান। এখন ঐ সম্পত্তি কার মালিকানা হিসেবে ফারায়েয করা হবে?
উত্তর : কোন বস্তুর উপর হেবা (দান) পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হল, উক্ত বস্তু গ্রহিতা কর্তৃক কব্জা করা অর্থাৎ নিজ আয়ত্বে নিয়ে নেয়া। পক্ষান্তরে যদি কব্জা না করে তাহলে হেবা পরিপূর্ণ হয় না। চাই উক্ত হেবা লিখিতভাবে হোক বা মৌখিকভাবে।
প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে আপনার মা আপনার মেজ ভাইকে তার জীবদ্দশায় নিজ মালিকানাধীন যে দশ শতাংশ জমি হেবা করেন তা আপনার মেজ ভাইয়ের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ তিনি ঐ সম্পত্তির ভোগ-দখলে ছিলেন না। সুতরাং উক্ত সম্পত্তি আপনার মায়ের মীরাসী সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য হবে এবং তার জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে ফারায়েয অনুযায়ী ভাগ-বণ্টন হবে। (সূরা নিসা- ১৩, মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী; হা.নং ১২২৩, ফাতাওয়া শামী ৪/৫০৯, ৫/৬৯০, ফাতাওয়া আলমগীরী ৪/৪৯৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৪/৪২১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৭/৫২১, ৫৩৪)

মাওলানা রিযওয়ান
বকশী বাজার, ঢাকা
২৫২ প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোন কোন পান বিক্রেতা পানের জর্দার মধ্যে আগুন লাগিয়ে ক্রেতার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়; তখন আগুন নিভে যায়। অনেকে বলে, এটা পান বিক্রি করার একটি কৌশল বা বিনোদনের জন্য করা হয়।
আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে পান খাওয়ার কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি না? এভাবে পান খাওয়ার হুকুম কি? এর হুকুম কি ধুমপানের বিধানের মত? বিষয়গুলো দলীলসহ জানালে উপকৃত হব।
উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত সূরতে যদিও ধুমপান করার মত হুকুম প্রযোজ্য হবে না; কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণ বেহুদা ও অনর্থক। আর এ ধরনের বেহুদা ও অনর্থক কাজ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বিরত থাকা কর্তব্য। (সূরা মুমিনূন- ৩, ফয়যুল কাদীর ১/৩২)

মাওলানা আবিদ হুসাইন
ভোলা
২৫৩ প্রশ্ন : আসর নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে রুকূর তাকবীর দিতে ভুলে গেছেন। এক ব্যক্তি কিছুই শুনতে না পেয়ে ইমাম সাহেবের সাথে রুকূ করতে পারেনি। পরে ইমাম সাহেবের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে অবশিষ্ট নামায ইমাম সাহেবের সাথে আদায় করেছে। কিন্তু ইমাম সাহেবের সাথে সালাম না ফিরিয়ে একাকী এক রাকআত পড়ে সাহু সিজদা করে সালাম ফিরিয়েছে। জানার বিষয় হলো, ঐ ব্যক্তির নামায সহীহ হয়েছে কি না?
উত্তর : যে ব্যক্তি নামাযের প্রথম রাকআত থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে আদায় করে; তবে ঘুম, অসচেতনতা, ভিড় ইত্যাদি ওযরের কারণে নামাযের মধ্যে দু-একটি রুকন বা রাকআত ছুটে যায়, তাকে ফিকহের পরিভাষায় 'লাহেক' বলা হয়।
লাহেক ব্যক্তির নামায আদায়ের নিয়ম হলো, যখনই সে ঘুম থেকে জাগ্রত হবে বা যখনই তার ওযর চলে যাবে তখন ছুটে যাওয়া রুকনগুলো কিরাআত ব্যতীত একাকী আদায় করে ইমাম সাহেবের সাথে শরীক হয়ে যাবে– যদি

তখন পর্যন্ত ইমাম সাহেব নামাযরত থাকেন।
তবে যদি কেউ ছুটে যাওয়া রুকনগুলো প্রথমে আদায় না করে যথারীতি ইমাম সাহেবের সাথে নামায শেষ করে ইমামের সালাম ফেরানোর পরে ছুটে যাওয়া রুকনগুলো একাকী আদায় করে আবার তাশাহ্হুদ পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফেরায় তাহলেও তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব তরক করার কারণে সে গুনাহগার হবে। আর এ ওয়াজিব যেহেতু ইমামের ইক্তিদায় থাকাকালে তরক হয়েছে সেহেতু এর জন্য সাহু সিজদার বিধান নেই। সাহু সিজদার দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হবে না; বরং ইস্তিগফার করে নিতে হবে।
অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত সূরতে উক্ত ব্যক্তি যদি ইমামের সালাম ফেরানোর পরে শুধু তার ছুটে যাওয়া রুকূটি করে তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নিত তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যেত। কিন্তু তা না করে সে পূর্ণ এক রাকআত আদায় করার দরুণ ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকটি রুকন তথা অতিরিক্ত দু'টি সিজদা, একটি রুকূ এবং কিয়াম করা ও এর মাধ্যমে ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব করার কারণে তার নামায ফাসিদ হয়ে গেছে। এখন উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। এছাড়া তার জন্য আর কোন পন্থা নেই। (ফাতাওয়া শামী ১/৫৯৪, আল-বাহরুর রায়িক ১/৫১৮, ৬২৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১০৩, ১৩৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩৭৫, নামায কে মাসাইল কা ইনসাইক্লোপেডিয়া ২/৩০০)

মুহাম্মাদ মনসূর আলী
ঝাউচর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৫৪ প্রশ্ন : (ক) আমার বাড়ির কাছে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। যার পশ্চিম দিক নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮০ ডিগ্রিতে। কিন্তু স্কেলে কিবলা ২৭০ ডিগ্রিতে দেখানো হয়েছে। এর শরীয়তসম্মত ফয়সালা কাম্য।
(খ) আমার ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে কিছু সুদের টাকা জমা হয়েছে। এ টাকা মসজিদের টয়লেট বানানোর কাজে ব্যবহার করতে পারব কি?
উত্তর : (ক) যে মুসল্লীগণ সরাসরি কাবা শরীফের সামনে উপস্থিত নন তাদের কিবলামুখী হওয়ার জন্য কাবা ঘর বরাবর মুখ করা জরুরী নয়। বরং কাবা শরীফ যে দিকে রয়েছে, সে দিকে মুখ করাই যথেষ্ট। সে হিসেবে মূল কিবলা থেকে যদি ৪৫ ডিগ্রির কম ডানে বা বামে রোখ হয়ে থাকে, তাহলেও নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। তবে ৪৫ ডিগ্রির বেশি ব্যবধান হয়ে গেলে নামায শুদ্ধ হবে না। উক্ত মসজিদে যেহেতু মাত্র ১০ ডিগ্রি ব্যবধান হয়েছে, সেহেতু নামাযের কোন অসুবিধা হবে না। (সূরা বাকারা- ১৪৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২/১৭৩, ফাতাওয়া শামী ১/৪২৮, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহ ১/৭৫৮, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৩১৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ২/১০৮)
(খ) একান্ত অপারগতার কারণে ব্যাংকে চলতি অ্যাকাউন্ট খোলা জায়েয আছে; সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা জায়েয নেই। তবে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে অপারগ হয়ে কেউ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে থাকলে তার অ্যাকাউন্টে যে সুদের টাকা জমা হবে, তা নিজের কাজে খরচ করা জায়েয নেই। উক্ত টাকা সওয়াবের নিয়ত না করে গরীব-মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে। উক্ত টাকা দিয়ে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী টয়লেট বানানো জায়েয হবে। তেমনিভাবে সুদের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসার টয়লেট তৈরি করাও বৈধ হবে। (সূরা বাকারা- ২৭৬, ফাতাওয়া শামী ৪/২৮৩, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৪/২৪৫, কিফায়াতুল মুফতী ৮/৫৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/১৯২)

মুহাম্মাদ মনসূর আলী
ঝাউচর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৫৫ প্রশ্ন : দুই ঈদের খুতবায় তাকবীর বলার সুন্নাত তরীকা কী? তাকবীর দ্বারা কি শুধু তাকবীরই (الله اكبر) উদ্দেশ্য, নাকি সম্পূর্ণ তাকবীরে তাশরীক (الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد) উদ্দেশ্য? শরয়ী প্রমাণাদি দ্বারা জানিয়ে বাধিত করবেন।
হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখিত 'খুতবাতুল আহকাম'-এ দুই ঈদের খুতবা যে পদ্ধতিতে লেখা আছে অর্থাৎ খুতবার মাঝে মাঝে তাকবীরে তাশরীকের উপস্থিতি–এর কোন প্রমাণ আছে কি?
উত্তর : দুই ঈদের খুতবায় তাকবীরের সুন্নাত তরীকার ব্যাপারে মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক নামক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিন ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহনের পর তাকবীর বলা সুন্নাত। প্রথম খুতবা শুরু করবে লাগাতার নয়বার তাকবীর (الله اكبر) দ্বারা এবং দ্বিতীয় খুতবা শুরু করবে লাগাতার সাতবার তাকবীর (الله اكبر) দ্বারা।
আর তাকবীর দ্বারা শুধু তাকবীরই উদ্দেশ্য। কেননা যদি তাকবীরে তাশরীকও পড়া হয় তাহলে খুতবার তুলনায় তাকবীরের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে। আর একথা সর্বস্বীকৃত যে, খুতবা তাকবীরের তুলনায় বেশি হতে হবে। তবে তাকবীরের ধারাবাহিকতা তাহমীদ ও তাহলীলে শেষ করা উচিত– যেমনটি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর আমলে পাওয়া যায়।
আর 'খুতবাতুল আহকাম'-এ দুই ঈদের খুতবা যেভাবে লেখা রয়েছে অর্থাৎ খুতবার মাঝে মাঝে তাকবীর বলা এ ব্যাপারেও সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে একটি হাদীস রয়েছে; তবে তা সনদের দিক থেকে যঈফ। তাছাড়া আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এ পদ্ধতি পাওয়া যায়নি। স্বয়ং খুতবাতুল আহকামের লেখক হযরত থানবী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রথম খুতবার শুরুতে নয়বার, দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাতবার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে চৌদ্দবার তাকবীর বলা– তার স্বহস্তে লিখিত কিংবা তার তত্ত্বাবধানে লিখিত ফাতাওয়ার কিতাবগুলো এর প্রমাণ বহন করে। দেখুন, ইমদাদুল আহকাম ১/৭৫৩। সুতরাং খুতবার মাঝে মাঝে তাকবীর না বলাই শ্রেয়।
(মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ৩/২৯০, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল-আসার ৫/৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১২৮৭, ফাতাওয়া শামী ৩/১৭৫, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫৩৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৫৫, আল-বাহরুর রায়িক ২/১৭৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৭/৩০৭, কিতাবুল মাসাইল ১/৪৭৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/১৯১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৩৭)

ইলমে নাফে'র জন্য শর্ত

মুফতী মাসউদুর রহমান

গত ২১শে ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার জামি'আতুল আবরার (কাঁচপুর মাদরাসা)-এ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মাসিক 'তরবিয়াতী মজলিস'-এ মুফতী মাসউদুর রহমান সাহেব দা.বা. (মুহাদ্দিস, জামি'আ আশরাফিয়া সাইনবোর্ড, ঢাকা) -এর প্রদত্ত বয়ান।

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য মেহেরবানী যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মত নগণ্য কিছু বান্দাকে এক মোবারক মজলিসে, জান্নাতী পরিবেশে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ।

মানুষ কেন আশরাফুল মাখলুকাত?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। যমীনের উপরে ও যমীনের নিচে এবং আসমানের নিচে ও আসমানের উপরে যত সৃষ্টি আছে সকল সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ। এজন্য মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা বলা হয়। মুফতী শফী রহ. তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে মানুষকে তিনটি কারণে সৃষ্টির সেরা জীব উল্লেখ করেছেন,

১. পোশাকের কারণে : মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর পোশাক বা লেবাস নেই। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই পোশাকের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষ পোশাক পরায় এর দ্বারা তার সৌন্দর্য বেড়েছে। কেউ যদি পোশাক পরা ছেড়ে দেয় তাহলে লোকে তাকে পাগল বলবে। লোকে বলবে, তার মস্তিষ্ক বিগড়ে গেছে। কাজেই পোশাক মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রতীক।

২. খাদ্যের মাধ্যমে : দুনিয়ার সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে মানুষের খাদ্য সবচেয়ে মানসম্মত, রুচিসম্মত। দেখুন, ভাত হয় চাল থেকে। এই চালের উপর যে ছিলকা থাকে যেটাকে আমরা কুড়া বলি– এটা মানুষের খাবার, নাকি পশু-প্রাণীর খাবার? ক্ষেতের ফসল থেকে ধান মাড়ানোর পর যেটা অবশিষ্ট থাকে এটাকে খড় বলে। খড়ও পশুদের খাবার। মানুষের খাবার হল ধানের মধ্যে সবচেয়ে দামী ও সুন্দর অংশটা; যেটা রুচিসম্মত এবং মার্জিত। এভাবে মানুষের সকল খাবারের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, মানুষের খাবারই সবচেয়ে সেরা, দামী এবং রুচিসম্মত।

৩. বাসস্থানের মাধ্যমে : মানুষের মত সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা অন্য কোন প্রাণীর নেই। গরু, ছাগল, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি যত প্রাণী আছে, এমনকি জিনদের জন্যও মানুষের মত এমন সুন্দর থাকার ব্যবস্থা নেই। কাজেই সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থাও একথার প্রমাণ দেয় যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বনী আদমকে আমি সম্মানিত করেছি'। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭০)

সেরাদের সেরা কে?

সৃষ্টির সেরা মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় লাভকারী মুমিন বান্দাগণ। ঈমান হলো সম্মানিত মানুষ হওয়ার মাপকাঠি। আর ঈমান ব্যতীত যে কোন মানুষ পশুতুল্য; বরং পশুরও অধম। সূরা তীনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। তবুও তাদেরকে আমি নিম্ন থেকেও নিম্নস্তরে পৌঁছে দিই। কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং নেককাজ করে তাদের নয়। বরং তাদের জন্য রয়েছে অনিঃশেষ পুরস্কার'। (আয়াত- ৫-৭) সূরা আসরের মধ্যেও এসেছে, 'যামানার কসম! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্য ও সবরের উপদেশ দেয় তারা তা থেকে মুক্তি পাবে'। কাজেই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হলো, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিন বান্দাগণ।

মুমিনদের মধ্যে সেরা কে?

অতঃপর মুমিন বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ইলমের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমগণ। আল্লাহ এদেরকেই মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। এরা হল মানুষদের মধ্যে কামেল-পূর্ণাঙ্গ ঈমান ওয়ালা। সূরা রহমানে বলেন, 'দয়াময় আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বলতে শিখিয়েছেন'। (আয়াত- ১-৪) আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দিয়ে মানবজাতির মনুষ্যত্বের পরিচয় পেশ করেছেন। যার মধ্যে এই কুরআনের ইলম নেই সে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাতারে না। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে (উলামা-তলাবা) আশরাফুল মাখলুকাত বানানোর পর, ঈমান দিয়ে, তদুপরি ইলমে দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন। এজন্য এ নিয়ামতগুলোর শুকরিয়া আদায় করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরা সব থেকে শ্রেষ্ঠ। এই কথাটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কথায় বুঝিয়েছেন। বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে যে কুরআন শিখে এবং শিখায়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৩৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীনী ইলম শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয় সে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্ব মালের দ্বারা, চেহারার দ্বারা আসে না। শ্রেষ্ঠত্ব হল কুরআনের ইলমের দ্বারা। এই ইলম যারা শিখে এবং শেখায় তারা হল দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

হীনমন্যতার কারণ

অনেক সময় ছাত্ররা হীনমন্যতায় ভোগে। মনে করে, এমন ইলম শিখে কী হবে? কোন সার্টিফিকেট নেই। এটা আমাদের ভুল ধারণা। আমরা নিজেদেরকে না চেনার ফল এটা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমরা চিনতে পারিনি। ফলে আজ আমাদের এই হীনমন্যতা। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহ আমাদেরকে দেয়ার জন্য এখানে এনেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এতে কোনো ভুল নেই, কোনো সন্দেহ নেই। হযরত আলী রাযি. এ কথাই বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে বণ্টন করেছেন এতে আমরা খুব খুশি এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে ইলমে দীনের জন্য কবুল করেছেন, আর যারা জাহেল-মুর্খ আল্লাহ তাদেরকে মাল দেয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন'।

ইলম ও মালের মাঝে পার্থক্য

এদু'টোর মধ্যে পার্থক্য কী? এ দু'টোর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে- ইলম মানুষকে রক্ষা করে, কিন্তু মাল? মানুষকেই রক্ষা করতে হয় তাকে। ইলম মানুষকে হিফাযত করে

দুনিয়াতে-আখেরাতে। দুনিয়া থেকে শুরু করে একেবারে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত। দুনিয়ার জিন্দেগীতে, আখেরাতের জিন্দেগীতে, পুলসিরাতে। সব জায়গায় ইলম মানুষকে হিফাযত করে। আর তার জন্য খাঁটি ইলম হতে হবে। তাহলেই তা মানুষকে হিফাযত করবে। আর মালকে মানুষ হিফাযত করতে হয়। এমনকি মাল সবসময় থাকেও না। আমি মালকে খুব সংরক্ষণ করে রাখি। সিন্দুক ভরে রাখি। কিন্তু যখনই এই মাল নিয়ে আমি কিছু কিনতে যাই তখনই সে আমার সাথে গাদ্দারী করে বসে। অন্যের হাতে যাওয়া মাত্রই তার হয়ে যায়। এমনকি আমাকে সে চিনেই না। তাহলে বুঝা গেল এই মাল দুনিয়াতেই আমার সাথে মুনাফেকী করে। আর আখেরাত যে কী করবে তা তো বলাই মুশকিল। এজন্য আমাদের উচিত হযরত আলী রাযি. এর কথাটা অন্তরে গেঁথে নেয়া। ইলম অনেক বড় সম্পদ। ইমাম মুহাম্মদ রহ. মাঝে মাঝে কিতাব পড়তে পড়তে নিজ রুমের মধ্যে একা একাই আনন্দে চিৎকার করতেন। আর বলতেন 'আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই ইলমের মধ্যে যে মজা-স্বাদ দিয়েছেন শাহযাদারা তা কোথায় পাবে?' দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের যা আছে তারচেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি মজা রেখেছেন আমাদের এই ইলমের মধ্যে। এজন্য কোন ধরনের হীনমন্যতা আমাদের মাঝে না থাকা চাই। বরং দিলে দিলে খুব বেশি আল্লাহর ফয়সালার উপর রাযী থাকা। শুকরিয়া আদায় করা।

ইলম কাকে বলে?

ইলমের পরিচয় দিতে গিয়ে যাত্রাবাড়ির শাইখ ছোট্ট একটা আয়াত পড়ে থাকেন- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. (সূরা ফাতির- ২৮)

এটাই মূলত ইলমের তা'রীফ– ইলমের পরিচয়। ঐ ইলমকে ইলম বলে, যে ইলম মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয়-ভীতি, আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। এটাই প্রকৃত ইলম। যদি ইলম শিখে দিলের মধ্যে ভয়-ভীতি না আসে তাহলে সেটা প্রকৃত ইলম নয়। আমার ব্রেইনের কারণে শিখতে পারলেও এটা আসল ইলম না। ইলম শিখছি কিন্তু নামায পড়ছি না, ইলমও শিখছি টিভিও দেখি, ইলম শিখছি আবার গুনাহও করছি, যবানে গীবত-শেকায়েত করছি, বদ নযরী করছি তাহলে বোঝা যাবে, আমার আসল ইলম হাসিল হচ্ছে না।

ইলম দুই প্রকার

ইলম দুই প্রকার- ১. ইলমে নাফে' বা উপকারী ইলম। ইলম মানুষের উপকার করে। মাল মানুষের ক্ষতি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতে বলেছেন- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফি'আ' (হে আল্লাহ আমাকে 'উপকারী ইলম' দাও)। অন্য দোআর মধ্যে আছে-'আউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা' 'হে আল্লাহ ঐ ইলম থেকে পানাহ চাই যা উপকার করেনা'। কী বুঝা গেল? ইলম দুই প্রকার। একটা ইলমে নাফে'। আরেকটা ইলমে গাইরে নাফে' বা অপকারী ইলম। আবু জাহেলের ইলম ছিল। ইলমের পাহাড় ছিল। যেজন্য তাকে আবুল হিকাম বলা হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ইলম তাকে আবু জাহল বানিয়েছে। নিকৃষ্ট বানিয়েছে। অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি., তাদেরও ইলম ছিল। এই ইলম তাদেরকে একেবারে দুনিয়ার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়েছে। আমরা এখানে শিখতে এসেছি কোন ইলম? ইলমে নাফে'-উপকারী ইলম।

ইলমে নাফে'র শর্ত

মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. দেওবন্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ইলমে নাফে' হাসেলের জন্য ৪টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। ছাত্র ভায়েরা কথা গুলো মনে রেখো। ৪টি গুণ/বিষয় থাকলে ইলমে নাফে' পাওয়া যায়-

১. ফাহমে কামেল : পরিপূর্ণ বুঝ। কুরআন-হাদীসের বুঝটা পরিপূর্ণ হওয়া চাই। কারণ, এই কুরআন এমন জিনিস; 'যা কাউকে বানায় গোমরাহ আর কাউকে দেখায় হেদায়েতের রাস্তা। তাই উহার বুঝটা পরিপূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় মওদূদী মার্কা আলেম হতে সময় লাগবে না। এ রকমও আছে যে, অনেক ভ্রান্ত আকীদার লোক এই সঠিক পন্থায় কুরআন রিসার্চ করে হেদায়াত পেয়ে গেছে পরিপূর্ণ বুঝ থাকার কারণে। সুতরাং ইলমে নাফে' পেতে হলে ১নম্বর শর্ত হল পরিপূর্ণ বুঝ থাকতে হবে। আর এই বুঝ কিতাবের পাতায় পাওয়া যায় না। এটা পাওয়া যায় উস্তাদদের সীনায়। কোত্থেকে নিতে হয়? হুযূরদের সীনা থেকে নিতে হয়। এটা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সীনায় দিয়ে দিয়েছেন জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে। রাসূলের সীনা থেকে এসেছে সাহাবীদের সীনায়। সাহাবীদের থেকে তাবেয়ীদের সীনায়, এভাবে পর্যায়ক্রমে আসতে আসতে আপনাদের উস্তাদ যারা আছেন তাদের সীনায় এসেছে। এই ফাহমে কামেল বা দীনের সঠিক বুঝ সরাসরি উস্তাদদের সীনা থেকেই নিতে হবে। কেননা তা কিতাবের হাশিয়া বা শরাহ-শুরুহাতে পাওয়া যায় না।

২. একীনে কামেল : যে ইলম শিখছি তার উপর একশত ভাগ একীন থাকা। সাহাবায়ে কেরাম শিখেছেন যে, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ রিযিক দিবেন। এর উপর তাদের একশ ভাগ একীন ছিল। বাড়িতে খানা নেই তো একীন ছিল যে, নামাযের মাধ্যমে খানা পাওয়া যাবে। তাই সাথে সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামায পড়ে আসতেন, খানার ব্যবস্থা না হলে আবার গিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। একবার, দুইবার, তিনবার, এভাবে চতুর্থবার নামায পড়ে এসে দেখতেন আল্লাহ পাক খানার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। কিসের কারণে? একীনের কারণে। সাহাবায়ে কেরাম কুরআন থেকে যা কিছু শিখেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছেন তার উপর তাদের শতভাগ একীন ছিল। আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে ঐরকমই মু'আমালা করেছেন। হযরত সুমামা ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, একদা গ্রীষ্মকালে হযরত আনাস রাযি. এর নিকট তার বাগানের মালি অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তিনি পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং নামায পড়লেন। তারপর মালিকে বললেন, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ? সে বলল, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তিনি পুনরায় নামায পড়লেন। এভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বললেন, দেখো! সে উত্তর দিল, আমি পাখির ডানা পরিমাণ মেঘ দেখছি। তিনি নামায ও দু'আয় মশগুল থাকলেন। এরপর তার মালি এসে বলল, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে এবং বৃষ্টি হচ্ছে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৭/২১) বর্ণনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

جاء أنسا أكار بستانه في الصيف فشكا العطش فدعا بماء فتوضأ وصلى...

যে ইলম শিখছি এর মাধ্যমে আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সমাধান দিবেন এই একীন দিলের মধ্যে একশত ভাগ থাকা চাই। যাদের একীনের অভাব আছে তারাই কওমী মাদরাসায় পড়ে আবার গোপনে গোপনে আলিয়ায় পরীক্ষা দেয়। কওমীর তো সার্টিফিকেট নেই এ পড়া

পড়ে কী আর হবে? একটু সার্টিফিকেট দরকার। তাই দাখিল, কামিল, ফাযিল দেয়। ফাযিল/টাযিল হয়ে এরপর পুরা বেকুব। পুরা ফাযিল হতে পারলে তারপর যথেষ্ট মনে করে। এই ধরনের লোকদের ইলম শেখার কোন প্রয়োজন নেই। তাই বলেছেন, ইলমে নাফে' হাসেল করতে হলে দ্বিতীয় শর্ত হল একীনে কামেল। এ একীনও নিজে নিজে হাসিল হয় না। হক্কানী রব্বানী আল্লাহওয়ালাদের থেকে তা হাসিল করতে হয়। যাদের এই একীন হাসিল আছে তাদের থেকে শিখতে হয়। তাদের সুহবতে যেতে হয়। তাদের জুতা উঠাতে উঠাতে এই একীন হাসেল হয়। হযরত আমীনী রহ. এর ইন্তেকালের কিছু দিন আগের ঘটনা। ছাত্রদেরকে জমা করে তিনি কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, দেখো! তোমরা আমাকে অনেক কিছু মনে করো। আমার ইলম আছে, এই আছে, সেই আছে। তোমরা আমার মধ্যে যত গুণ দেখছো এর সবই হল ছদর সাহেব হুযূর–শামসুল হক ফরিদপুরী রহ, এর পায়ের ধুলার বরকত। তাঁর জুতা টানার, তার জুতা সোজা করার তাওফীক আমার হয়েছে। তাঁর এই খেদমতের বরকতে আল্লাহ আমাকে এই গুণাগুণ দান করেছেন। এভাবে আমাদের সকল আকাবিরদের জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তারা বড় হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল তাঁরা তাদের উস্তাদ, পীর-মাশায়েখ, মুরুব্বীদের সাথে জুড়ে ছিলেন। একেবারে গভীর সম্পর্ক রেখেছিলেন। সম্পর্কের বরকতে আল্লাহ তাদেরকে একীনে কামেল দান করেছেন।

৩. আযমে কামেল : আমি যা শিখছি সেই মোতাবেক পরিপূর্ণ আমল করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আমল করে দেখিয়েছেন। ইলম শেখার সাথে সাথে আমল না করাকে আল্লাহ তা'আলা গাধার কর্মের সাথে তুলনা করেছেন। যে ইলম শিখল কিন্তু আমল করল না সে কার মত? গাধার মত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী আমলের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু সেই মোতাবেক আমল করেনি, তারা ঐ গাধার মত যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করেছে মাত্র'। (সূরা জুমু'আ- ৫)

যদি একটা গাধার পিঠে একসেট দাওরায়ে হাদীসের কিতাব; যেমন- বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ত্বহাবী, মুয়াত্তা মালেক ও মুয়াত্তা মুহাম্মদ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে এগুলো স্রেফ বহন করতে পারবে। তাই বলে কী তাকে আলেম বলা হবে? ঠিক তেমনই কেউ যদি শুধু কিতাব শিখে, মেধার কারণে বেফাক পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করে কিন্তু আমল নেই, তাহলে সেও উক্ত আয়াতে বিবৃত গাধার মত। শুধু কিতাবের বোঝা মাথায় বহন করল। এজন্য দুই নম্বর শর্ত হল আযমে কামেল। ইলমের সাথে সাথে আমলের পোখতা ইরাদা করা। মিথ্যা কথা বলা যাবে না শুনেছি; ব্যস! মিথ্যা বলব না। চক্ষু হিফাযত করতে হবে শুনেছি, আর বদনজরী করব না। উস্তাদরা যা বলেন সব আমার ভালোর জন্য বলেন মনে করে পালন করা। কেননা উস্তাদরা হলেন ছাত্রদের জন্য সবচেয়ে বড় খায়েরখাহ– কল্যাণকামী। কোন উস্তাদ ছাত্রদের খারাবী চান না। একথাটা যে বুঝেছে সে কামিয়াব হয়ে গেছে।

৪. মুজাহাদা কামেল : পরিপূর্ণ মুজাহাদা বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা মেহনত করা। ইলমের জন্যও করতে হয়, আমলের জন্যও করতে হয়। বাসা-বাড়িতে থাকলে আপনারা ভালো-ভালো খাবার খেতে পারতেন। বাসার তুলনায় মাদরাসার খানা একটু নিম্নমানের হয়। বাসায় থাকলে ভালো আরামে শুতে পারতেন, মাদরাসায় ফ্লোরে শুতে হয়। এভাবে খুঁজতে থাকলে দেখা যাবে যে, বাসার তুলনায় মাদরাসায় অনেক কষ্ট হচ্ছে। এগুলো হবে ভাই, কেন? শুধু ইলম শিখার জন্য। কষ্ট মানার যদি যোগ্যতা থাকে, মন-মানসিকতা থাকে তাহলে আল্লাহ ইলমে নাফে' দান করেন।

গাঙ্গুহী রহ. বলেন, এই ৪টি গুণ যদি কারো মাঝে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ অবশ্যই ইলমে নাফে' দান করবেন। এগুলো না থাকলে ইলম হাসিল হবে, তবে তা নাফে' হবে না। সেই ইলমের নাম ইলমে গাইরে নাফে' 'অপকারী ইলম'। এর দ্বারা নিজেরও ক্ষতি করবে, জাতিরও ক্ষতি করবে। আজকের দুনিয়ার দিকে দেখুন, যত বিদ'আতী বা ভণ্ডরা আছে দেখলে পাওয়া যায়, তাদের মূলে কোন না কোন আলেম ছিল। যার ইলম ছিল কিন্তু তা ইলমে নাফে' না। ফলে এই ইলম দ্বারা সে নিজেও বিদ'আতী হয়েছে, অন্যদেরকেও বিদ'আতে লিপ্ত করেছে।

ইলমের মাকসাদ

যে ইলম শিখছি তার মাকসাদ কী? তার মাকসাদ দুটি: **১.** ইলম শিখছি এজন্য যে, আমার জীবনের যত প্রয়োজন আছে এসব প্রয়োজন আমি আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি পুরা করব। সাহাবায়ে কেরামের ইলম এই ইলম ছিল। তারা যে কোন বিষয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হয়েছেন। এক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল কেমন ছিল? সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখনই তার কোন প্রয়োজন হত তিনি নামাযের মাধ্যমে তা সমাধান করেছেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৩১৯)

২. আমি হলাম 'ওয়ারিসুল আম্বিয়া' নবীর ওয়ারিস। নবী যে কাজগুলো করেছেন, আমাকেও সে কাজগুলো করতে হবে। নবী কী কাজ করেছেন? উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতী বানানোর চিন্তা করেছেন। জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত নবী আর আসবেন না। নবীর কাজগুলো উলামায়ে কেরামের আঞ্জাম দিতে হবে। তাই উলামায়ে কেরামের মধ্যে এমন ইলম, এমন সিফাত আসা দরকার যেন সকলকে নিয়ে সে চলতে পারে। জান্নাতী বানানো, জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা। অর্থাৎ উম্মতের দরদ দিলের মধ্যে আসা। উম্মতের কী অবস্থা? উম্মত কোথায় যাচ্ছে? কী করছে? তাদের ঈমান-আক্বীদা, মু'আমালাত-মু'আশারাতের কী অবস্থা? খবর নিলে দেখা যাবে এরা সব নামে মুসলমান, কাজে-কর্মে ইহুদী-নাসারাদের মত। এই উম্মতকে বাঁচানেওয়ালা কে? তাদের সঠিক পথ দেখাবে কে? উলামায়ে কেরাম তাদের পথ দেখাবে। তো আমাদের ইলমের মাকসাদ হবে- (১) আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করা। (২) উম্মতের দরদ দিলের মধ্যে পয়দা করা। যদি এদুটি বিষয় আসে তাহলে বুঝা যাবে আমার মধ্যে ইলমের মাকসাদ-উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। আমাদের ইলমটা উপকারী ইলম হয়েছে।

আল্লাহওয়ালা হও

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি এতে আল্লাহ বলেছেন-'যারা ইলম শিখছো, শিখাচ্ছো তোমরা সকলে আল্লাহওয়ালা হও'। (সূরা আলে ইমরান- ৭৯)

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়। কারণ তোমরা যদি সম্পর্ক না গড়, তাহলে দুনিয়ার মধ্যে আর কারা সম্পর্ক গড়বে। আমাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়া চাই। আর এ সম্পর্ক হবে যদি সহীহভাবে আমরা ইলমের চর্চা করি।

ইলমের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হল গুনাহ। ইলম ও গুনাহ একসাথ হতে পারেনা। থানবী রহ. বলেন, ছাত্রদের গুনাহই তো কয়েকটা- রাস্তায় গেলে চোখের গুনাহ হয়। মুখের দ্বারা গীবত-শেকায়াত করে। আর অহংকার করে। ইদানিং আরো একটা যোগ হয়েছে– মোবাইল ফোন। এ কয়েকটা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলে তোমরা সহজেই আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে। তিনি বলতেন, 'ছাত্রদের জন্য আল্লাহর ওলী হওয়া খুব সহজ। কয়েকটা গুনাহ ছাড়তে পারলেই যথেষ্ট'। তাই কোন প্রকার গুনাহ যেন না হয় এজন্য খুব চেষ্টা করবে। একা একা গুনাহ ছাড়তে না পারলে উস্তাদের সাহায্য নাও। ছোট-বড় সব ছাত্র-ভাইকেই বলছি, উস্তাদকে খাস মুরুব্বী বানিয়ে নিন। অর্থাৎ সকল বিষয়ে উস্তাদের সাথে পরামর্শ করে চলা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মোটকথা জীবনচলার পথে যত বিষয় আছে সব বিষয়ে কোন না কোন উস্তাদের সাথে পরামর্শ করে চলা। এখন কেন যেন ছাত্রদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, উস্তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না। শুধু ক্লাসে সবক ধরে। ব্যস! আমাদের যামানায়ও আমরা কিতাব নিয়ে উস্তাদদের কাছে যেতাম। এখন কিতাব নিয়ে উস্তাদের কাছে যাবে এর প্রচলন নেই। ঐ যে, শরাহ-শুরুহাত আছে। 'বাংলা শরীফ' আছে। এটাকেই যথেষ্ট মনে করছে। খাঁটি ইলম তো আসবে উস্তাদের কাছ থেকে। এজন্য উস্তাদের সাথে যে ছাত্রের সম্পর্ক যত গভীর হবে ঐ ছাত্রের ইলমের দ্বারা ফায়দা তত বেশি হবে। এজন্য খুব চেষ্টা করবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে, উস্তাদদের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক রেখে চলতে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করেন। তাকওয়া-তাহারাতের সঙ্গে চলার তাওফীক দান করেন। ইলমে নাফে' দান করেন। ইলম অর্জনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার অফুরান খাযানা থেকে আমাদেরকে দান করেন। আমীন!

অনুলিখন : আল আমীন বিন সাবের আলী
শিক্ষক, জামি'আতুল আবরার (কাঁচপুর মাদরাসা) সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

আরাকান, আরাকান, আমার বন্ধু গো আরাকান...

-মুহিব খান

তোমার আমার এক উঠানের মাঝখানে এক নদী,
দুই দেহে এক প্রাণের বাঁধন বইছে নিরবধি।
তোমার দুঃখের অশ্রু আমার দু'চোখ বেয়ে পড়ে,
তোমার বুকের যখম থেকেও আমার এ খুন ঝরে।
তোমার ব্যথার চিৎকারে ওঠে আমার গানের সুর,
কাছাকাছি আছি, পাশাপাশি আছি তবু তুমি কত দূর।

আরাকান, আরাকান, আমার বন্ধু গো আরাকান,
তুমি আর আমি ভাই ভাই জেনো আমরা মুসলমান।
হাহাকার করে সাম্পান, কাঁদে নাফ দরিয়ার বান,
তুমি পরাধীন থাকবে না জেনো মজলুম আরাকান।

বহুকাল ধরে তুমি আর আমি সুনিবিড় প্রতিবেশী,
তুমি মুসলিম আরাকানী আর আমি যে বাংলাদেশী।
শত বেদনায় চৌচির হয়ে চেয়েছিলে আশ্রয়,
আমি তো দুয়ার খুলি নাই তবু ভুলি নাই পরিচয়।
জানি একদিন পথ খুঁজে খুঁজে পেয়ে যাবে তুমি পথ,
তোমার আকাশে স্বাধীন পতাকা উড়বেই পতপত।

আরাকান, আরাকান, আমার বন্ধু গো আরাকান,
আমাকেও পর ভেবো নাকো তুমি রেখো নাকো অভিমান।
হাহাকার করে সাম্পান, কাঁদে নাফ দরিয়ার বান,
তুমি পরাধীন থাকবে না জেনো মজলুম আরাকান।

ওরা ভাবছে, তুমি হারবে; না না, আমি জানি তুমি পারবে,
তুমি দাঁড়াবে, কদম বাড়াবে, সব শত্রুসেনাকে তাড়াবে,
তুমি শোককে শক্তি করে নিয়ে ঐ জালিম-শাহীকে হারাবে।
জানি তোমাকে পোড়ানো ধোঁয়া-ছাই থেকে উঠবে দ্রোহের ঝড়,
নরপিশাচের মসনদ ভেঙ্গে পড়বেই থরথর।

আরাকান, আরাকান, আমার বন্ধু গো আরাকান,
তোমার জন্য গেয়ে যাই আমি মুক্তির জয়গান।
হাহাকার করে সাম্পান, কাঁদে নাফ দরিয়ার বান,
তুমি পরাধীন থাকবে না জেনো মজলুম আরাকান।

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)
-অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত

বিপন্ন রোহিঙ্গাদের সহায়তায়
আল-আবরার সেবা সংস্থা

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, দেশ ও জাতির যে কোন সঙ্কটকালে ও দুর্যোগময় মুহূর্তে সাধ্যানুযায়ী পাশে দাঁড়িয়ে বিপন্ন মানবতার প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। সে ধারাবাহিকতায় জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা'র আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র উদ্যোগে আল-আবরার সেবা সংস্থা (নিবন্ধন কার্যক্রম চলছে) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক জরুরী সভায় আল-আবরার সেবা সংস্থা ইতিহাসের নির্মমতম জুলুমের শিকার রোহিঙ্গা মুহাজিরদের সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর এ উদ্দেশ্যে রাবেতা সদস্য, আলেম-তালেবে ইলম, দীনদরদী সাধারণ ব্যক্তিবর্গ ও সাহায্য-আগ্রহীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই একটি শাক্তিশালী ফান্ড গঠিত হয়। সংস্থার ত্রাণ তহবিলে এ পর্যন্ত ৯২,১০,১৬৩/- (বিরানব্বই লক্ষ দশহাজার একশত তেষট্টি) টাকা সংগৃহ হয়েছে। কুরবানীর ঈদের পর থেকে সংস্থাটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বহুমুখী সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকগণ থেকে শুরু করে সকল দায়িত্বশীল ও সহযোগীগণ ত্রাণ-কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে পাঁচটি ক্যাম্পে নয়টি সফর সম্পন্ন করেছে। এবং পালাক্রমে একটি গ্রুপ সার্বক্ষণিক সশরীরে উপস্থিত থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও অক্লান্ত মেহনত-মুজাহাদার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত ত্রাণকার্যক্রম তদারকি করছে। আল-আবরার সেবা সংস্থার উদ্যোগে এ যাবৎ পরিচালিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত একটি রিপোর্ট তুলে ধরা হল।

এক. নগদ অর্থ প্রদান :
বালুখালী, থ্যাংখালী, উনছিপ্রাং, লেদা ও মুছনী– ঘনবসতিপূর্ণ এই পাঁচটি ক্যাম্পের প্রায় প্রতিটি ঘরে সংস্থার কর্মীগণ নগদ অর্থ পৌঁছে দিয়েছে। এ কাজে কর্মীদেরকে কাদাপানি, খানা-খন্দক, ও টিলা-পাহাড়ের কষ্টসাধ্য চড়াই-উৎরাই পেরোতে হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০৫০টি পরিবার নগদ অর্থ-সহায়তা পেয়েছে। এ খাদে প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ ২০,৫০,০০০/- টাকা।

দুই. বিধবা সহায়তা : আল-আবরার সেবা সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে একহাজার বিধবা পরিবারকে নিয়মিত সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্যাম্পগুলোর ব্লক অনুযায়ী বিধবা তালিকা প্রস্তুত করে এ পর্যন্ত একহাজার বিধবাকে কয়েক দফা নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সাহায্যকৃত অর্থের পরিমাণ ৪০,০০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ) টাকা। এছাড়া পঞ্চাশটি বিধবা পরিবারের বসবাস উপযোগী একটি বিধবা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে।

তিন. নলকূপ স্থাপন : শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে সুপেয় পানির সঙ্কট সমাধানে নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। নতুন ক্যাম্প উনছিপ্রাংয়ে শুরুর দিকে একটি নলকূপেরও অস্তিত্ব ছিল না। হাজার হাজার শরণার্থী পানির অভাবে ক্যাম্প ছাড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেখানে জরুরী ভিত্তিতে তিনটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানিসঙ্কটের উপস্থিত সুরাহা করা হয়। এছাড়াও বালুখালি, থ্যাংখালি ও লেদা-মুছনি ক্যাম্পে মোট সাতাশটি নলকূপ স্থাপন করা হয়। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৬,০৬,০০০/- (ছয় লক্ষ ছয় হাজার) টাকা।

চার. টয়লেট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা : এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে ৫০টি টয়লেট ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ খাতে ব্যয়িত হয়েছে ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। প্রয়োজন বিবেচনা করে আরও টয়লেট নির্মাণ এবং পয়ঃনিষ্কাশন নালা খননের পরিকল্পনা রয়েছে।

পাঁচ. মসজিদ নির্মাণ : নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের প্রায় সকলেই মুসলমান। মুসলমান হওয়ার কারণেই তো মগদস্যুরা তাদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সংস্থার কর্মীদের নিকট রোহিঙ্গারা মসজিদ নির্মাণের আকুতি জানিয়েছিল এবং কিছু কিছু স্থানে তারা মসজিদের জন্য জায়গাও নির্ধারণ করে রেখেছিল। তাদের নির্ধারিত জায়গায় এবং অবস্থানগত সুবিধার ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ১৬টি মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বালুখালী ক্যাম্পে ৭টি, থ্যাংখালীতে ২টি, উনছিপ্রাং-এ ৫টি, লেদা ও মুছনীতে ২টি। এ খাতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৫,৪০,০০০/- টাকা।

ছয়. মসজিদে তাবলীগী মেহনত : নবনির্মিত মসজিদগুলো আবাদ রাখার লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকেই হাফেয, আলেমগণের যোগ্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিটি মসজিদে ইমাম-মুআযযিন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইমাম-মুআযযিন সাহেবানদের জন্য মাসিক সম্মানীরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেমতে চলতি মাসের সম্মানী তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আল-আবরার সেবা সংস্থা কর্তৃক নির্মিত অধিকাংশ মসজিদে নিয়মিত আযান ও জামা'আত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি মসজিদে তাবলীগের পাঁচ কাজও যথারীতি শুরু হয়েছে। সংস্থার তত্ত্বাবধানে তিনচিল্লা, একচিল্লা ও তিনদিনের সাথীদের তালিকা প্রস্তুত করে মশওয়ারাক্রমে আমীর নির্ধারণ করে দাওয়াতের মেহনতও শুরু করা হয়েছে। আরও খুশির খবর হল, উনছিপ্রাং-এ সংস্থার অর্থায়নে নির্মিত আল-আবরার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদকে রোহিঙ্গা সাথীরা 'তবলীগর মরকয' ঘোষণা দিয়ে পুরো ক্যাম্পে ব্যাপকভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত শুরু করেছে। এই মারকায থেকেই ক্যাম্পে অবস্থিত মসজিদগুলোতে বর্তমানে ১০টি রোহিঙ্গা জামা'আত দাওয়াতের মেহনত করে যাচ্ছে।

সাত. মাইকে সর্বপ্রথম আযানের ধ্বনি : রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন সেবা-সংস্থার উদ্যোগে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হলেও পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আযানের ধ্বনি পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। আল-আবরার সেবা সংস্থা কর্তৃক নির্মিত মসজিদগুলোতেই সর্বপ্রথম সোলার চালিত সাউন্ড সিস্টেম ও মাইকের ব্যবস্থা করা হয়। এর সূচনা হয় বালুখালী ক্যাম্পে অবস্থিত আল-আবরার কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে। মাইকে আযান শুনে সেদিন সবার মনে-মুখে সে কী অপার আনন্দ! এ ব্যবস্থাপনার কাজে মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী সাহেবের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত ১৬টি মসজিদের ১১টিতেই সাউন্ড সিস্টেম ও মাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১,৮৭,০০০/- (এক লক্ষ সাতাশি হাজার) টাকা। এছাড়া পনেরটি মসজিদে

ফ্যান, লাইটসহ সোলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ খাতে খরচ হয়েছে ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা।

আট. মসজিদভিত্তিক মকতব প্রতিষ্ঠা : সংস্থা কর্তৃক নির্মিত প্রতিটি মসজিদে কুরআনী মকতব কায়েম করা হয়েছে। শুধু বালুখালীর মসজিদুল আবরারে এখন ছয়শতাধিক শিশু নিয়মিত দীনী শিক্ষা শিখছে। সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিটি মসজিদ এখন শত শত আলিফ, বা, তা পাঠকারী শিশুদের দ্বারা সরব থাকে। শিশু শিক্ষার্থীদেরকে মসজিদগুলো থেকে নিয়মিত সকালের নাস্তার সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য সকলের দু'আ ও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

নয়. টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার : প্রতিটি শিশু যাতে সহজ পদ্ধতিতে সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারে এজন্য সপ্তাহব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার একদল দক্ষ প্রশিক্ষককে সেখানে পাঠানো হয়েছে। শিশুদের শিক্ষার মান যাচাইপূর্বক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আরো প্রশিক্ষক পাঠানো হবে।

দশ. চিকিৎসা সেবা : আল-আবরার সেবা সংস্থার উদ্যোগে ক্যাম্পগুলোতে ফ্রি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। সেবার মান রক্ষার জন্য আল-আবরার সেবা সংস্থা দেশের বিশিষ্ট ডাক্তারদেরও শরণাপন্ন হয়েছে। ডা. ইখলাসুর রহমান ও ডা. ইবাদুর রহমান সাহেবসহ দেশের প্রথিতযশা অনেক সম্মানিত ডাক্তারগণ এতে আন্তরিকভাবে শরীক হয়েছেন।

সংস্থার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জামি'আ রাহমানিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম ও ফুযালাগণ পর্যায়ক্রমে সেখানে অবস্থান করেছেন। এ পর্যন্ত সফরকারী বিশিষ্ট আলেমগণের মধ্যে রয়েছেন শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক, জামি'আ রাহমানিয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযূর, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী, মুফতী ইবরাহীম হাসান, মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ, মুফতী বুরহানুদ্দীন কাসেমী, মুফতী আব্দুল হাই খুলনাবী, মাওলানা কারী মুনীরুজ্জামান, মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী, মুফতী সাঈদ আহমাদ, মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী, মুফতী উমর ফারূক বিক্রমপুরী, মাওলানা আনওয়ারুল হক, কারী কামারুজ্জামান প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। এছাড়াও যারা ক্যাম্পগুলোতে দিন-রাত সর্বিক্ষণিক অবস্থান করে উপর্যুক্ত কার্যক্রম সরাসরি আঞ্জাম দিয়েছেন, তারা হলেন মাওলানা জামালুদ্দীন (মুহতামিম, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর) মাওলানা মাহমূদুল আমীন (পরিচালক, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া), মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী, মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, মাওলানা হাফিজুর রহমান মাদারীপুরী, মাওলানা জামালুদ্দীন রাহমানী, মাওলানা আবূ সাইম, মাওলানা যুবায়ের আব্দুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল হান্নান, মাওলানা মাকসূদুর রহমান, মাওলানা সাঈদুয্যামান, মাওলানা আব্দুল আযীয, ডা. আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা মাহমূদুল হাসান কুমিল্লা, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা নজরুল ইসলাম ফেনী প্রমুখ। এছাড়াও রোহিঙ্গা ত্রাণ কার্যক্রমে আল-আবরার সেবা সংস্থা কর্তৃক প্রথম সফরে হযরত কারী মুনীরুজ্জামান সাহেব হুযূরের নেতৃত্বে যে গ্রুপটি অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে বাঁশবাড়ি জামে মসজিদের লাইফ মেম্বার আলহাজ্জ শামসুল আলম বাহার ও তরুণ আলেমে দীন মাওলানা রবিউল ইসলাম এবং পরবর্তীতে বাইতুল ওয়াহ্হাব জামে মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল জলীল ভূইয়াঁ ও জনাব তাওহীদুল ইসলাম সাহেব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের কার্যক্রমে শুরু থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও রাহবারীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন রাবেতা সদস্য মাওলানা মাহমূদুল হাসান গুনবী ও তার সহযোগীরা। আল-আবরার সেবা সংস্থা মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করত তাদের প্রতি এবং সকল দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

-রাবেতা ডেস্ক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা কর্তৃপক্ষ ও আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে আবনায়ে রাহমানিয়ার উদ্যোগে পরিচালিত 'আল-আবরার সেবা সংস্থা'টির রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এই সেবা সংস্থার গৃহীত নীতিমালার আলোকে দেশের সর্বত্র, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বহুমুখী সেবাকার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে ইনশাআল্লাহ। বন্যাদুর্গত কুড়িগ্রাম ও নিপীড়িত রোহিঙ্গা মুহাজিরদের মধ্যে প্রস্তাবিত এ সংস্থাটির নামানুসারেই যাবতীয় ত্রাণ ও সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সংস্থার ব্যানারে আগামীতেও যাবতীয় ত্রাণ ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেবা সংস্থাটির সরকারি বৈধতার জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, জামি'আর মুরুব্বীগণের সমন্বিত নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী সদস্যগণের খসড়া প্রস্তাব ইতোমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরে জমা দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই এর সকল আইনী কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

জামি'আ রাহমানিয়ার সকল ফুযালায়ে কেরাম, তলাবায়ে ইযাম এবং শুভাকাঙ্ক্ষী-সহযোগীগণকে সর্বোতভাবে আল-আবরার সেবা সংস্থার সদস্যভুক্ত হয়ে এর কার্যক্রমকে গতিশীল করার আহ্বান করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ : ০১৮১২৪৬৪৩৬২, ০১৭৪৭৯৯৯৯৭৩, পরামর্শ প্রদান : ০১৮১১২২৮৯৯২

জীবনের পাতা থেকে...

সবার জীবনেই ডায়েরীতে লেখার মত স্মরণীয় কিছু দিন থাকে। স্মৃতিবিজড়িত সেই দিনগুলো জীবনের নানা বাঁকে এসে উঁকি দেয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আমার জীবনের তেমনই একটি দিন। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ছুটি চলছে। মহল্লার মসজিদে গাশতের দিন। আসরের নামায পড়তে মসজিদে গেলাম। এলাকার মুবাল্লিগ ভাইয়েরা জড়ো হয়ে মশওয়ারা করছেন। আমিও শরীক হলাম। সবার নিকট থেকে রায় নিয়ে আমীর সাহেব একেকটা আমল বন্টন করছেন। এবার গাশতের আদবের রায় গ্রহণের পালা। পরিচিত একভাই পরামর্শ দিলেন, 'ইনশা-আল্লাহ! আজকের গাশতের আদব হাফেয আবূ বকর সিদ্দীক বলতে পারে।' শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। এই প্রথম এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন। আল্লাহ তুমি কল্যাণের ফায়সালা করো। এখন আমীর সাহেব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। সিদ্ধান্তের পূর্বে বললেন, 'সবাই দুরূদ শরীফ পড়ি। যদি নিজের রায়ের উপর ফায়সালা হয়, তাহলে ইসতিগফার পড়ব, আর অন্যের রায়ের উপর ফায়সালা হলে আলহামদুলিল্লাহ বলব। আমীর সাহেব খানিক চুপ থেকে ফায়সালা দিলেন, 'ইনশা-আল্লাহ! আজ গাশতের আদব হাফেয আবূ বকর সিদ্দীক বলবে।'

আসরের নামায শুরু হল। নামায শেষে হিম্মত করে দাঁড়ালাম। মনের আয়নায় তখন ভেসে উঠল কুরআনের বাণী– علمه البيان (আমিই তাকে শিখিয়েছি উপস্থাপনা।) হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাকশক্তি দান করুন, দক্ষ আলেমে দীন হিসেবে কবুল করুন এবং আমৃত্যু সুন্নাতে নববীর খাদেম হিসেবে কবুল করুন। অগোছালো কয়েক মিনিট কথা বলে বসে পড়লাম। এরপর আরেক ভাই এসে বয়ান পুরা করলেন। দিনটির কথা আমার স্মরণে থাকবে বহুদিন। সেদিনের সেই সাহস থেকেই আমি আগামীর প্রেরণা পেয়েছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দীক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

কুসুম্বা জামে মসজিদে

কুসুম্বা। আত্রাই নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের পশ্চিমে অবস্থিত একটি মনোরম স্থান। যা কিছুতে কুসুম্বার সুনাম-সুখ্যাতি তার অন্যতম কুসুম্বা শাহী জামে মসজিদ। পাঁচ টাকার নোটে ছবি দেখে অনেক আগেই এর প্রতি কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম। সময়-সুযোগ হয়নি বলে এতদিন যাওয়া হয়নি। অবশেষে একসকালে আমরা কয়েকজন বন্ধু কুসুম্বা দেখতে গেলাম। বড় গাড়ি থেকে নেমে মূল স্থানটিতে যেতে হলো ভ্যানযোগে। ভ্যানওয়ালা কুসুম্বা মসজিদ সম্পর্কে বেশ কিছু মজার কাহিনী শোনাল। শুনে কিছুটা আনন্দিত এবং কিছুটা অবাকও হলাম। একসময় আমরা পাঁচ টাকার নোটে দেখা পরিচিত সেই কুসুম্বা মসজিদে উপস্থিত হলাম ।

কুসুম্বা মসজিদকে ঘিরে রয়েছে শত বছরের পুরনো গল্প, স্মৃতি এবং লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী। মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় চারশত আটান্ন বছর পূর্বে আফগান শূরী শাসক গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে। মসজিদের প্রবেশদ্বারে বসানো ফলকে মসজিদের নির্মাণকাল লেখা রয়েছে হিজরী ৯৬৬ সন আর খ্রিস্টাব্দ ১৫৫৪-১৫৬০ সন। মসজিদটি সুলতানী আমলের উজ্জ্বল নিদর্শন। আয়তনে বেশ বড়। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কালো ও ধুসর বর্ণের পাথর এবং পোড়ামাটির ইস্টক দ্বারা নির্মিত। জ্যামিতিক নকশার আদলে পোড়ামাটির সুদৃশ্য কারুকাজ খচিত মাটির টালি, মিহরাবে বিভিন্ন ফুল, লতা-পাতা, ঝুলন্ত শিকল ও মনোরম শৈল্পিক কারুকাজ যা মুসলিম স্থাপত্যকলার অপূর্ব সমাহার। ইটের তৈরি এই মসজিদের দেয়ালগুলো বাইরে ও ভিতরে পাথর দ্বারা আবৃত। মসজিদের চারকোণে চারটি আটকোণা বুরুজ ও অভ্যন্তরে একটি প্রশস্ত স্তম্ভ। যার উপর মোট ছয়টি গম্বুজ আছে। মসজিদের সম্মুখভাগে বিশাল আয়তনের একটি স্বচ্ছ জলাশয় আছে। ধারণা করা হয়, এর পানিতে পারদ মিশ্রিত থাকায় ঘাষ-লতা কিছুই জন্মে না। মসজিদের একদিকে কয়েকটি সুড়ঙ্গও রয়েছে। যাতে প্রবেশ করলে মানুষ প্রকাণ্ড একটি পুকুরের মুখ দিয়ে বের হয়। আর বেশ কিছু এমন আশ্চর্য পাথরও আছে; কেউ জানে না যে, সেগুলো কোথা থেকে এসেছে।

আমি ও আমার সাথীরা কুসুম্বা দেখে বেশ পুলকিত হলাম। কিছু সময়ের জন্য হলেও ফিরে গেলাম দূর সেই সোনালী অতীতে। ফেরার সময় বারবার মসজিদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল দূর অতীতের মুসল্লীরা আমাদের ডেকে ডেকে বলছে, হে মুসাফির! আমাদের জন্য দু'আ করে যাও। আমরা তাদের জন্য দু'আ করলাম– হে আল্লাহ! তুমি তাদের কবুল করে নাও এবং তাদের এই মসজিদকে দীনের কেন্দ্র হিসেবে কবুল কর। আমীন।

মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

লাভের গুড়ে বালি...

সাপ্তাহিক ছুটিতে আমি আর এক 'দেশীভাই' বাড়িতে যাচ্ছি । পায়ে একজোড়া ছেঁড়া জুতো। পায়ে'র সাথে আরেকটা শব্দ যুক্ত হবে– আপাতত। অর্থাৎ আপাতত পায়ে দিয়েছি। উদ্দেশ্য গুলিস্তান গিয়ে নতুন একজোড়া কিনে আপাতত'র হিসেব চুকিয়ে ফেলব। আগ থেকে দেখছি এবং শুনছি, গুলিস্তানের ফুটপাত নাকি জুতো কেনার মোক্ষম জায়গা। ভালো মান এবং কম দাম দুটো সুবিধাই নাকি একসঙ্গে পাওয়া যায়!

গুলিস্তান পৌঁছে এ দোকান ও দোকান ঘুরে দর কষাকষির একশেষ করে

১৮০ টাকা দিয়ে পছন্দসই একজোড়া জুতো কিনলাম।
যোহরের সময় হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম, জামাআত শুরু হওয়ার আগেই দু'জনে জামাআত করে গাড়িতে উঠব। মসজিদে প্রবেশ করে সামনে ব্যাগ আর পেছনের বাক্সে জুতা রেখে নামাযে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করে জুতা আনতে গিয়ে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। জুতার পরিবর্তে চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করলাম। হায়! হায়! আমার সদ্য কেনা জুতোজোড়া বিলকুল লাপাত্তা হয়ে গেছে! পেরেশান হয়ে কাছের-দূরের, রেখেছি কি রাখিনি সবগুলো বক্সে চিরুণী অভিযান চালালাম। কিন্তু না! উহার কোন পাত্তা নেই। খাদেম সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, চাচা! আমি এই বাক্সে একজোড়া নতুন জুতো রেখেছিলাম; সেটা পাচ্ছি না! তিনি বললেন, গুলিস্তানে কোন কিছু চুরি হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা অহরহ ঘটছে । তবে একথা সত্য যে, মসজিদে যারা আসে তাদের মধ্যে নামাযীরা চোর নয়, আর চোর ব্যাটারা নামাযীই নয়।
কী আর করা! 'উড়ো খই ভগবানে নঃম' এর মতো জুতোজোড়া সদকার নিয়ত করলাম, আর চোরকে মাফ করে দিলাম।
যাক, জুতা তো চুরি গেল, কিন্তু খালি পায়ে বাড়ি যাওয়ার উপায় কি? 'বোঝার ওপর শাকের আটি' মনে করে সেই ছেঁড়া জোড়াও যে ফুটপাতে বিসর্জন দিয়েছি। অগত্যা ১৮০ টাকা দিয়ে আরেক জোড়া কিনতে হল। এখন আমার গুলিস্তানের কমদামী জুতোর ফেসভ্যালু দাঁড়াল ৩৬০ টাকা। মনকে বোঝালাম, রে আবুল হোসেন! তুই আসলে জুতোজোড়া মুহাম্মদপুর থেকেই কিনেছিস, কিন্তু পুরনো হওয়ার ভয়ে পায়ে দিয়েছিস গুলিস্তানে এসে। আর মুহাম্মদপুরে তো এ জুতো বিনা দরদামেই ৩৬০ টাকাতে পাওয়া যায়!! আসলে বান্দার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সবই বেকার, যদি না আল্লাহ তা'আলাও ইচ্ছা করেন।

মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

ভুল তো আমারই ছিল

২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্ব ইজতিমার দ্বিতীয় পর্ব চলছে। আমাদের মাদরাসা থেকে অনেক ছাত্র-উস্তাদ ইজতিমায় এসেছেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমিও সেখানে শরীক হয়েছি। সারা দিনমান দেশ-বিদেশের বড় বড় মুরুব্বিয়ানে কেরাম মূল্যবান নসীহত পেশ করছেন। কথাগুলো এতই আলোকময় যে, মনে হচ্ছিল এগুলো তারা নিজ থেকে বলছেন না, ইলহামের মাধ্যমে বলানো হচ্ছে। শ্রোতাগণও গভীর মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শুনছেন, আত্মস্থ করছেন। এখানে সকলেই যেন আখেরাতমুখী, পার্থিব চিন্তা-ভাবনার বালাই নেই। কেমন যেন জান্নাত জান্নাত পরিবেশ!
ইজতিমার দ্বিতীয় দিন। মাদরাসার তালাবাদের উদ্দেশ্যে বয়ান হল। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও গুরুত্বপূর্ণ নসীহত শোনার তাওফীক হল। পরবর্তীতে আরও উপকৃত হব ভেবে স্মার্টওয়াচের মাধ্যমে বয়ানটি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় শেষের দিকের কিছু মূল্যবান কথা রেকর্ড হল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ থাকায় ফেরার পথে অজান্তেই আমার হাঁটা কিছুটা দ্রুত হয়ে গিয়েছিল। এদিকে অন্যান্য মুসল্লীরা হাঁটছিলেন স্বাভাবিক গতিতে। এমন সময় উল্টোদিক থেকে সুন্নাতী লেবাস পরিহিত একব্যক্তি আমার সামনে চলে আসল। তাল সামলাতে না পারায় লোকটির পায়ের উপর আমার পা পড়ে গেল। আমার গতিরোধ হল। কপালে ভাঁজ পড়ল। আর মেজাযটা উঠলো জ্বলে। তেরছা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। অমনিই আমাকে অবাক করে দিয়ে লোকটি বলে উঠলো, ব্যথা পেয়েছেন ভাই? ভুল হয়ে গেছে, মাফ করবেন।
চমকে উঠলাম। আরে, আমিই না সবার চেয়ে দ্রুত হাঁটছি! সবাইকে ঠেলে-ঠুলে পাশ কাটিয়ে চলছি! দোষ তো আমার, আমারই না মাফ চাওয়ার দরকার ছিল!! কী করব, না করব ভাবতে ভাবতেই লোকটি ভিড়ের মাঝে মিলিয়ে গেল। এবার দোষের বোঝা মাথায় নিয়ে আমার অপরাধী পা দু'টো অচল হয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটের পথ হয়ে গেল পঞ্চাশ মিনিটের।
ধীরে ধীরে তাঁবুতে পৌঁছলাম। সাথীদের সঙ্গে গল্প জুড়লাম। নাহ, কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছে না। বিবেকের তাড়া খেয়ে বিকালবেলা ছুটে গেলাম সেই রাস্তায়। মাফ চাইব বলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্যাকুল চোখে তার খোঁজ করলাম। দেখা মিলল না। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে মেলার কথাও না।
আজ এতদিন পরেও যখনই সে কথা মনে পড়ে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না; বিবেকের দংশনে আহত হই বারবার। আসলে ভুল তো আমারই ছিল।

মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম ফরিদপুরী
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, ঢাকা

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল :
rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯

০১৯২৭৩২৪৬৪৭

০১৯১২০৭৪৪৯৫